হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে।
মনুঃ।

It is a superficial view to take of the cause of the degeneracy of a community of people to say that it has gone down solely because it is divided into innumerable castes, it enforces infant marraige, it prohibits widow marriage and keeps women in seclusion.—*Mr. Justice Chandavarkar.*

কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত।

কলিকাতা

১৩১৭, আশ্বিন মাস।

মূল্য পাঁচ আনা।

প্রকাশক :—গ্রন্থকার,
৭১।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট,— কলিকাতা ;
প্রিণ্টার :— শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌.—কলিকাতা।

ভূমিকা।

ভূমিকায় যে সমস্ত কথা লেখা উচিত, তাহার প্রায় সমস্তই পুস্তকের সূচনায় লিখিয়াছি। ময়মনসিংহ—গৌরীপুরের বদান্যবর জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়, তাঁহার জমিদারীর সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয় ও স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ মহাশয়ের উৎসাহে ও আনুকূল্যে বর্ত্তমান পুস্তকখানি জন-সমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। আমার স্নেহাস্পদ, জাতীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় সুহৃৎ ছাত্র এই পুস্তকস্থিত কয়েকটি তালিকার সংকলন-বিষয়ে আমাকে আংশিক সহায়তা করিয়াছেন। সাহায্যকারীদিগের প্রতি যথাক্রমে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপনোদ্দেশে এই ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিত হইল। "বসুমতী" পত্রিকায় এই প্রবন্ধ-মালার অন্তর্গত দুইটী প্রস্তাব প্রায় অবিকল প্রকাশিত হইয়াছে, একথায়ও এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক। হিন্দুজাতির ধ্বংসোন্মুখতা-সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজে যে ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এই পুস্তক-পাঠে যদি আংশিক ভাবেও অপনোদিত হয়, তাহা হইলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা,
৭ই আশ্বিন,
১৩১৭ সাল।   শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?

সূচনা।

একটা রব উঠিয়াছে—বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের আসন্নকাল উপস্থিত। বঙ্গে দিন দিন মুসলমানের যেরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি ও হিন্দুর যেরূপ বংশক্ষয় ঘটিতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা দেশ হইতে হিন্দুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে অধিকদিন লাগিবে না; বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ মুমূর্ষু জাতিতে পরিণত হইয়াছে। দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা প্রাপ্ত অবসর লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মিঃ ইউ, এন, মুখার্জ্জি) এই মতের প্রবর্ত্তনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি প্রথমে "বেঙ্গলী"-নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রে এতদ্বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে সেই প্রবন্ধগুলি A Dying Race নাম দিয়া স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা হয়। সেই সঙ্গে ঐ প্রবন্ধমালার মূল মর্ম্ম বঙ্গভাষায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া "হিন্দুসমাজ (নিবেদন-পত্র)" নামে মুদ্রিত করা হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার ২৫ সহস্র খণ্ড বিনা-মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তদ্দর্শনে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল মহোদয় "অমৃতবাজার পত্রিকায়" "A Dying Race—How Dying?" ইতি-শীর্ষক প্রবন্ধমালা প্রকাশ করিয়া কর্ণেল মহাশয়ের মতের কতিপয় ভ্রান্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় সে সকল প্রতিবাদের উত্তর-দান করিবার ক্লেশস্বীকার না করিয়া, তাঁহার মূল ইংরাজী প্রবন্ধগুলির অবিকল বঙ্গানুবাদ "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" নামে প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, তৎপরে "হিন্দুসমাজ" সম্বন্ধে আর

একখানি নিবেদন-পত্র লিখিয়া তাহারও ২৫ সহস্র খণ্ড তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করাইয়াছেন। ঐ নিবেদন-পত্রেও হিন্দুজাতিকে মুমূর্ষু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইরূপ অধ্যবসায়-সহকারে বাঙ্গালী হিন্দুর মুমূর্ষু দশার কথা প্রচারিত হওয়ায় বঙ্গীয় সমাজে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। অনেকেই প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। আমিও সেই ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়াই এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আমার অনুসন্ধানের ফল এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে জনসাধারণের গোচর করিতেছি। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী সেন্সস রিপোর্ট বা আদম সুমারীর বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণে প্রথমে তদ্বিষয়ক আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

---

(১)

ভারতে আদম-সুমারী।

ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে লোক-সংখ্যা-গণনার ব্যবস্থা এদেশে নিতান্তই অভিনব ব্যাপার ছিল না। সেকালের হিন্দু-মুসলমান নরপতিগণের কেহ কেহ রাজ্যের বিশেষ বিশেষ অংশের লোক-সংখ্যার আংশিকভাবে গণনা করাইয়াছিলেন, ইতিহাসে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মহারাষ্ট্র-ভূপতিগণও রাজ্যের কোনও কোনও অংশের জন-সংখ্যা-নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, দেখা যায়। তাহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও স্থানে স্থানে ঐরূপ অসম্পূর্ণ চেষ্টা হইয়াছিল। ১৮৫৭।৮ অব্দের

সিপাহী-বিপ্লবের পর, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন-কালে, সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের লোক-সংখ্যা-নির্দ্ধারণে রাজপুরুষদিগের আগ্রহ প্রকাশ পায়। তথাপি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় ১৮৮১ অব্দের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতের লোক-সংখ্যা-গণনার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাই। ১৮৬৫ অব্দে সর্ব্ব-প্রথম এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়। ফলে, সেবার কেবল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন-সংখ্যা পরিগণিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বর্ষে মধ্য-প্রদেশসমূহে ও তাহার পরবর্ষে মান্দ্রাজ ও বেরার (বিদর্ভ) প্রদেশে লোক-গণনা কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৮৬৮ অব্দে পঞ্জাবের ও তৎপরবর্ত্তী অব্দে অযোধ্যা প্রদেশের জন-সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবিষয়ে বঙ্গদেশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় নাই। রাজধানী কলিকাতার লোক-গণনা-কার্য্য তাহার চারি বৎসর পরে, ১৮৭৬ অব্দে, সর্ব্বপ্রথম সম্পন্ন করা হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম জন-সংখ্যা-নির্দ্ধারণের যে চেষ্টা করা হয়, তাহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষ-জনক হয় নাই। গণনাকারীদিগের ঔদাস্য ও অজ্ঞতা নিবন্ধন উহাতে নানাপ্রকার ভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল। (বোর্ডিলন সাহেবের "সেন্সাস রিপোর্টের" ৪১ পৃষ্ঠার মন্তব্য দ্রষ্টব্য।) তাহার পর ১৮৮১ অব্দে আবার লোক-গণনা হয়। সেবার গোলযোগের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও গণনায় নানাবিধ ভ্রম প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। দশ বৎসর পরে, ১৮৯১ অব্দে, যে গণনা হয়, তাহাতে ভ্রম-নিবারণের জন্য সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। [illegible] বা গত ১৯০১ সালের লোক-গণনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয় এবং ঐ সময়ে যেরূপ নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্বের যত্ন-পূর্ব্বক সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে আর কোনও বারে সেরূপ করা হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, সেবারকার লোক-গণনা-বিভাগের অধ্যক্ষ গেট সাহেব পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বারের লোক-সংখ্যার একটি সংশোধিত তালিকা [illegible] করেন। (১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণের প্রথম খণ্ডের [illegible] দ্রষ্টব্য।) সেই সংশোধিত তালিকা হইতে খাস বাঙ্গালার হিন্দু [illegible] এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

খাস

	১৯ হিন্দু		১৮৯১ হিন্দু		১৮৮১ হিন্দু	
				৯৯,১৯১	৬২,০৭,৪০৯	৯ ৫৮ ৪২৯
মধ্যবঙ্গ	৩৮,৮৩,৩৬৭		৮,৭৯	১০,১৬৬	৩৫,৬৪,৫৮৪	৩৫,১২,৮৯৩
উত্তরবঙ্গ	৩৯,৩৮,৫২৬	৮,৭৬	৩৭,৩৯,৮৬১	৭৯,৬৫৫	৩৬,২৩,৬৪৪	৫৩,৮৩,৩৮৯
পূর্ববঙ্গ	৫৫,১৪,০১৫		৫১ ৫৬,৯৮৬	৯৯ ৮৫,৭৮১	৪৬,৭৩,৭১৫	৮৫,৪১.৪০৬
একুন	২,০১,৯১,০৮২		৮৯	৭৪,৫৯৩	১,৮০,৬৯,৩৫২	১,৮৩,৯৬,১১৭

নি—

গেট বাহাদুর পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকার সহিত বঙ্গদেশস্থ হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাত-পরিজ্ঞাপক আর একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সে তালিকাটিও এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

	১৮৮১ অ: হইতে ১৮৯১ খ্রী: পর্য্যন্ত।		১৮৯১ অ: হইতে ১৯০১ খ্রী: পর্য্যন্ত।	
	হিন্দু	মুসলমান।	হিন্দু	মুসলমান।
পশ্চিমবঙ্গ	৩·১	৪·২	৭·১	৮·৫
মধ্যবঙ্গ	৩·১	২·৭	৫·৫	৪·৫
উত্তরবঙ্গ	৩·২	৩·৬	৫·৩	৫·৩
পূর্ব্ববঙ্গ	১০·৩	১৬·৯	৬·৯	১২·৩

এই তালিকায় মনোযোগ করিলে স্পষ্ট হইবে যে, ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ অব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির হার সমান ছিল। হিন্দুর বৃদ্ধির হার শতকরা তিন জনের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ছিল—মুসলমানের বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গে যেমন কিঞ্চিৎ অধিক ছিল, মধ্যবঙ্গে তেমনই কিঞ্চিৎ কম ছিল। মোটের উপর প্রথম তিনটি বিভাগে গড়ে হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির অঙ্ক সমানই ছিল, বলিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে ভূমির উর্ব্বরতা-নিবন্ধন হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বংশ-বৃদ্ধির হার অন্য তিন বিভাগ অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের বৃদ্ধির হার হিন্দুর অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। পরবর্ত্তী দশবর্ষেও প্রথম তিন বিভাগে হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির হার গড়ে প্রায় সমানই ছিল। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই বৃদ্ধির অনুপাত হ্রাস পাইয়াছে—পূর্ব্ব আদম-সুমারীর বৃদ্ধির অনুপাতে উভয় সমাজেরই হ্রাস প্রায় সমান হারেই হইয়াছে। অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের হ্রাসের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কম। কিন্তু সেই জন্য হিন্দুজাতিকে "ধ্বংসোন্মুখ" বলা সঙ্গত কিনা, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

এস্থলে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী জনগণের মোট সংখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা বিগত তিন বারের ভারতীয় আদম-সুমারীর তালিকা-গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া

দিলাম। তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বাঙ্গালীর প্রকৃত অবস্থা বহু পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে।—

ভারতে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা।

অব্দ	সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে	বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে	ব্রহ্মদেশে	ভারতের অন্যান্য প্রদেশে
১৮৮১	৩,৮৯,৩৫,৪২৮	৩,৮৮,৪২,৮৪৮	৯৯,৭৪৫	২২,৮৩৫
১৮৯১	৪,১৩,৪৩,৬৭২	৪,১১,৩২,৭১৯	১,৭৯,২৮১	৩১,৭৭২
১৯০১	৪,৪৬,২৪ ,০৪	৪,৪৩,৮২,১৮৬	২,০৮,০৭৮	৩৩,৭৮৪

---

(২)

১৮৭২ অব্দের লোক-গণনার ফল।

বঙ্গদেশের প্রথম আদমসুমারীর ফল গেট সাহেবের তালিকায় উদ্ধৃত হয় নাই। এই কারণে, ১৮৭২ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ-পুস্তক হইতে গণনার ফল এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল,—

	হিন্দু।	মুসলমান।
পশ্চিমবঙ্গ	৬২.১৬,০৬০	৯,২৯,৩৯১
মধ্যবঙ্গ	৩৩,৩৪,৭২৬	৩১,৫৭,০২৬
উত্তরবঙ্গ	৩৬,৭৯,৯১১	৫৫,৭২,১৮৮
পূর্ব্ববঙ্গ	৪৮,৬৯,৭৩৪	৭৯,৫০,৫৩০
মোট—	১,৮১,০০,৪৩১	১,৭৬,০৯,১৩৫

কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্ব-কৃত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" নাম্নী পুস্তিকার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—

"১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথমে লোক-সংখ্যা গৃহীত হয়। সেই জন-গণনায় দেখা যায়, বঙ্গের অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা [illegible] কোটী একাত্তর লক্ষের অধিক ছিল এবং মুসলমানের সংখ্যা প্রায় এক কোটী সাতষট্টি লক্ষ ছিল।"

পূর্ব্বোক্ত অঙ্কের সহিত কর্ণেল মহাশয়ের অঙ্কের ঐক্য নাই। অপিচ "হিন্দু সমাজ" শীর্ষক নিবেদন-পত্রে মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"প্রথম গণনা ১৮৭২ সালে হয়। যখন গণনা ফল প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ৩৬৮ লক্ষ (!) বাঙ্গালী আছে। বাঙ্গালী অর্থ যাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।"

'সমগ্র বাঙ্গালা' বলিতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাকেই বুঝায়। এই সমগ্র-বঙ্গের বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা-সম্বন্ধে ১৮৭২ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণের ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

The total number of Bengali speaking people may thus be put down at between 37 and 38 millions.

অর্থাৎ "বাঙ্গালা যাহাদিগের মাতৃভাষা, সমগ্র বঙ্গে তাহাদিগের সংখ্যা ৩ কোটী ৭০ লক্ষ হইতে ৩ কোটী ৮০ লক্ষ পর্য্যন্ত হইতে পারে।" ইহা অবশ্য সেবারকার বঙ্গীয় লোকগণনা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ের একটা স্থূল অনুমান-মাত্র। প্রথম বারের লোক-গণনায় ভাষা-বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয় নাই। তথাপি পূর্ব্বলিখিত অনুমানকে একেবারে অসঙ্গত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় "৩৬৮ লক্ষ" (!) বাঙ্গালীর কথা কোথায় পাইলেন, তাহা বহু অনুসন্ধানেও স্থির করিতে পারিলাম না। তবে যদি তিনি "খাস বাঙ্গালা" বুঝাইতে অনবধানতা-বশতঃ "সমগ্র বাঙ্গালা" পদের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অনুমান-মূলক উক্তি কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্গত হইতে পারে।

এক্ষণে "খাস বাঙ্গালা" বলিতে কি বুঝায়, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। প্রাচীন কাল হইতে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ বাঙ্গালা দেশের অধিপতি, নবাব বা শাসনকর্ত্তার (ছোটলাটের) অধীন থাকায় ঐ দুইটি প্রদেশ

বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী লোকেরা যে প্রদেশে বাস করে, তাহাকে সরকারী কাগজপত্রে "বেঙ্গল প্রপার" বা খাস বাঙ্গালা বলা হয়। কিন্তু এই খাস বাঙ্গালার সীমা সরকারি কাগজ-পত্রে সর্ব্বসময়ে একপ্রকার থাকে না। রাজপুরুষদিগের শাসন-কার্য্যের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে উহার সীমা সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৮৭২ অব্দে মালদহ, শ্রীহট্ট ও কাছাড় এই তিনটি জেলা খাস বাঙ্গালার বা "বেঙ্গল প্রপারের" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। দ্বিতীয় আদম সুমারীর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও কাছাড় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মালদহ জেলাটিকে বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুর বিভাগের অধীন করা হয়। তদবধি খাস বাঙ্গালার পরিমাণ কমিয়া যায়। শেষবারের আদম-সুমারীর সময় গেট সাহেব মালদহ জেলাটিকে ও সেই সঙ্গে সিকিম প্রদেশকে খাস বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তৎপরে আবার লর্ড কর্জনের আমলে খাস বাঙ্গালার অধিকাংশ আসাম প্রদেশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

রাজপুরুষেরা শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য খাস বাঙ্গালার সীমার সময়ে অসময়ে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন; সেবিষয়ে প্রকৃতিপুঞ্জের আপত্তি করিবার অধিকার না থাকিতে পারে। কিন্তু সামাজিক হিন্দুর নিকট সামাজিক বাঙ্গালার সীমা অপরিবর্ত্তনীয় থাকা উচিত। দুঃখের বিষয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই তথ্যের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। তিনি প্রথমবারের আদম-সুমারীর যে গণনা-ফল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে, মিঃ সি, জে, ওডোনেলের উক্তির অনুকরণে, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের জন-সংখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের গণনার ফল-প্রকাশ-কালে তিনি সরকারি কাগজ-পত্রের অনুসরণ করিয়া মালদহ জেলাটিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! সামাজিক বিষয়ের বিচার-কালে রাজপুরুষদিগের এরূপ অন্ধ অনুকরণ কি সঙ্গত? ইহাতে কি তুলনা-মূলক বিচারে ভ্রান্তি ঘটে না?

সামাজিক ভাবে বিচারকালে মালদহ, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও মানভূম জেলাকে খাস বাঙ্গালা হইতে বর্জ্জন করা আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। কারণ,

মালদহ অতি প্রাচীন কাল হইতে গৌড় দেশের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। মালদহবাসীর সহিত বাঙ্গালার সামাজিক সম্বন্ধ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান। সেখানকার মোট ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার জনের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। গেট সাহেব বলেন, —

Maldah now forms part of the Bhagalpur Division but the greater part of it is in all respects an integral part of North Bengal.—p. 15.

শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী বাঙ্গালী। তাঁহাদিগের সহিত সরকারি "বেঙ্গল প্রপারের" বাঙ্গালীরা সামাজিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আসামের আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখক এলেন সাহেব বলেন, —

Sylhet differs but little from E. B. districts from which it was seperated in 1874, when Assam was formed into a seperate province.—p. 3.

মানভূমের কিঞ্চিদধিক ১৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৯ লক্ষ ৭২॥০ হাজারেরও অধিক বাঙ্গালী। মানভূম জেলার বাঙ্গালীদেরও সহিত অনেক বাঙ্গালী হিন্দু সামাজিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। মানভূম প্রাচীন রাঢ়দেশের অন্তর্গত; তদ্দেশ-প্রচলিত "বাঙ্গালা" অদ্যাপি "রাঢ়ী ভাষ" নামে পরিচিত। এমন অবস্থায় ইংরাজের শাসন-বিষয়ক সুবিধা অসুবিধার অনুরোধে কেমন করিয়া বলিব যে, উক্ত প্রদেশগুলি সামাজিক বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নহে? কার্ণেল মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান লেখক অপেক্ষা বঙ্গের সামাজিক অবস্থা-বিষয়ে নিঃসন্দেহে অধিকতর অভিজ্ঞ। তথাপি তিনি মালদহ, মানভূম, শ্রীহট্ট, ও কাছাড় প্রভৃতি প্রদেশের বাঙ্গালী ভ্রাতাদিগকে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ হইতে কেন বর্জ্জন করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, সামাজিক বাঙ্গালার ও সরকারি 'বেঙ্গল প্রপারের' লোকসংখ্যায় কত প্রভেদ, তাহা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তালিকা-দ্বয়ে নেত্রপাত করিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথম বারের আদম-সুমারীর সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রদেশসমূহের মধ্যে মানভূম ভিন্ন আর সকল জেলাই খাস বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। কুচবিহার প্রদেশটি খাস বাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও রাজপুরুষেরা

সামাজিক বাঙ্গালার লোক-সংখ্যা।

	হিন্দু	মুসলমান	মন্তব্য।
১৮৭২ অ:	১,৯৪,১৮,৮৬৭	১,৮৫,৯৪,৭৫৭	৮,২৪,১১০ হিন্দু অধিক।
১৮৮১ অ:	২,০৩,১৬,০০০	১,৯৭,৫৭,০০০	৫,৫৯,০০০ " "
১৮৯১ অ:	২,১৪,৫৮,৬১২	২,১৪,৬৫,২৮৬	৬,৬৫৪ মুসলমান অধিক।
১৯০১ অ:	২,২৭,৪৩,৪১০	২,৩৩,২৬,৯৮০	৫,৮৩,৫৭০ " "

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সামাজিক বাঙ্গালায় মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৮ লক্ষ ২৪ হাজার অধিক ছিল। ২০ বৎসর পরে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান দাঁড়ায়। শেষ আদম-সুমারীর গণনায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা প্রায় ৬ লক্ষ অধিক হইয়াছে। এই তারতম্যের কারণ, তৃতীয় ও দশম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায়—সংকলিত

"বাঙ্গালাদেশে মানুষ-গণনার ফল।

("হিন্দু-সমাজ" ২য় ভাগ হইতে উদ্ধৃত)

"সাল	হিন্দুর সংখ্যা	মুসলমানের সংখ্যা	মন্তব্য।
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ	হিন্দু ৪ লক্ষ অধিক
১৮৮১	১৭২॥০ লক্ষ	১৭৯ লক্ষ	মুসলমান ৬॥০ লক্ষ অধিক
১৮৯১	১৮০ লক্ষ	১৯৬ লক্ষ	মুসলমান ১৬ লক্ষ অধিক
১৯০১	১৯৪ লক্ষ	২২০ লক্ষ	মুসলমান ২৬ লক্ষ অধিক

"৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে হিন্দুদিগের সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। ৩০ বৎসর পরে সেই মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ২৬ লক্ষ বেশী হইয়াছে।"

[মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত এই তালিকায় মালদহ-বর্জ্জিত বর্ত্তমান 'বেঙ্গল প্রপারের' জন-গণনার ফল মূলতঃ সংকলিত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।]

সেখানকার লোক-সংখ্যা-গণনার সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ১৮৮১ অব্দের লোক-গণনায় দেখা যায় যে, কুচবিহারে ৬ লক্ষ ২ হাজার ৬২৪ জন লোক ছিল। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৪লক্ষ ২৭।০ হাজার ও মুসলমানের সংখ্যা ১লক্ষ ৭৪।০ হাজার ছিল। ইহাদিগের মধ্যে [illegible] অর্থাৎ ৫লক্ষ ৯৫॥০ হাজার জন বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী। দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখক মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, ১৮৭২ অব্দে কুচবিহারের জন-সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৩২॥০ হাজার ছিল। অর্থাৎ নয় বৎসরে ঐ প্রদেশের জন-সংখ্যা শতকরা ১৩ জন হিসাবে বাড়িয়াছিল। সে যাহা হউক, এক্ষণে কুচবিহার ও মানভূম প্রদেশের জনসংখ্যা প্রথম বারের সরকারি খাস বাঙ্গালার জন-সংখ্যার সহিত যোগ করিলেই আমাদিগের অভিলষিত সামাজিক বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সংখ্যা জানিতে পারা যাইবে :—

সরকারি খাস বঙ্গে	হিন্দু	১,৮১,০০,৪৩১	মুসলমান	১,৭৬,০৯,১৩৫
মানভূমে	"	৮,২৭,৯৯৬	"	৩৩,৬১১
কুচবিহারে	"	৩,৬০,৫০০	"	১,৫২০০০
মোট	হিন্দু	১,৯৩,০৮,৮৬৭	"	১৭৭,৯৪,৭৫৭

ইহাই প্রথম আদম-সুমারী অনুসারে সামাজিক বাঙ্গালার জন-সংখ্যা। সে সময়ে বঙ্গদেশস্থ হিন্দুদিগের মধ্যে কতজন বিদেশ অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে জীবিকার্জ্জনের জন্য বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতেছিল, তাহা জানা যায় না। পক্ষান্তরে সামাজিক বাঙ্গালার কত বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী হিন্দু বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশে, চাকরী ও তীর্থবাস-প্রভৃতি উপলক্ষে বাস করিতেছিল, তাহারও কোনও সংবাদ আদম-সুমারীর বিবরণীতে দৃষ্ট হয় না। তবে দ্বিতীয় আদম-সুমারীর সময়ে এ বিষয়ে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ১৮৭২ অব্দে ন্যূনাধিক ৬ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু সামাজিক বাঙ্গালার বাহিরে বাস করিতেছিল এবং সামাজিক বঙ্গে, অন্যান্য প্রদেশবাসী হিন্দুর সংখ্যা ন্যূনাধিক ৮ লক্ষ ছিল। পূর্ব্বোক্ত বঙ্গদেশস্থ হিন্দুর মোট সংখ্যা হইতে এই

৮ লক্ষ বিদেশী হিন্দু বাদ দিলে সামাজিক বাঙ্গালায় প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৮৫ লক্ষ ছিল বলিয়া স্থূলতঃ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম বারের আদম-স্থমারীর সময় সামাজিক বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৭৭ লক্ষ ৯৪৮০ হাজার ছিল, দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান-প্রধান জেলাসমূহের অনেক গ্রামেই, শিক্ষিত মুসলমান গণনাকারীর অভাবে, প্রথমবারে জনসংখ্যা পরিগণিত হয় নাই। এ বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যে সকল মন্তব্য পরবর্ত্তী আদম-স্থমারীর বিবরণ-পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় আট লক্ষ মুসলমান প্রথম বারের জন-গণনায় বাদ পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে ময়মনসিংহে প্রায় ৩॥০ লক্ষ, নোয়াখালিতে ১ লক্ষ ও নদীয়া যশোহর, জলপাইগুড়ি, মানভূম, দার্জ্জিলিং, ঢাকা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে অবশিষ্ট প্রায় ৩॥০ লক্ষ মুসলমান গণিত হয় নাই। সেই সঙ্গে কিছু হিন্দুও বাদ পড়িয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে। সেই জন-সংখ্যা বাদ না পড়িলে, ১৮৭২ অব্দে সামাজিক বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা ন্যূনাধিক ১ কোটী ৮৬ লক্ষ ছিল, দেখা যাইত। ইহার মধ্য হইতে বিদেশী মুসলমানগণের সংখ্যা বাদ দিতে হইবে। কারণ, বাঙ্গালা দেশে বিদেশী হিন্দুর ন্যায় অনেক বিদেশী মুসলমানও জীবিকার্জ্জনাদি কারণোপলক্ষে বসতি করিতেন। ইহাদিগের সংখ্যা বিদেশী হিন্দুদিগের সংখ্যার কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধাংশ ছিল বলিয়া অনুমান করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। তাহা হইলেই, প্রথম আদমস্থমারীর সময় সামাজিক বাঙ্গালায় প্রকৃত বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৮২ লক্ষ ৩০ হাজার ছিল, বলা যাইতে পারে। ৭ লক্ষ মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর যে সংখ্যা বাদ পড়িবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার পরিমাণ মুসলমানের সংখ্যার এক সপ্তমাংশ ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জন-গণনার সময়ে সামাজিক বাঙ্গালায় প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা স্থূলতঃ এইরূপ ছিল :—

হিন্দু	১,৮৬,১০,০০০	মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দু
মুসলমান	১,৮২,২৫,০০০	৩,৮০,০০০ অধিক।

এতদ্ভিন্ন	ভাগলপুর বিভাগে	২,৯০,০০০	(আনুমানিক)	হিন্দু অধিকাংশ।
	উড়িষ্যা "	৪৪,০০০	"	হিন্দু।
	ছোটনাগপুর "	৯০,০০০	"	"
	পাটনা "	২,৮০০	"	"
	ব্রহ্মদেশে	৮৫,০০০	"	হিন্দু-মুসলমান
	উত্তর ভারতে	১৫,০০০	"	হিন্দু।
	অন্যান্ত প্রদেশে	৩,০০০	"	হিন্দু।
	আসামে	৪,০১,১৩৫	"	হিন্দু-মুসলমান।
	সমগ্র ভারতে	৩,৭৭,৭১,১৩৫ বাঙ্গালী		

১৮৭২ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ-গ্রন্থে লিখিত ১ কোটী ৮১ লক্ষ বঙ্গীয় হিন্দুর সংখ্যা হইতে কর্ণেল মুখোপাধ্যায় শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের ৯ লক্ষ ৮৭॥ হাজার হিন্দু বাদ দিয়া খাস বাঙ্গালার বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৭১ লক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মুসলমানেরও সংখ্যা ঐ পদ্ধতি-ক্রমেই তিনি স্থির করিয়াছেন। এইরূপ সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করায় তাঁহার বহু পরিমাণে শ্রম লাঘব হইয়াছে সত্য; কিন্তু সেজন্য মানভূম, কুচবিহার, শ্রীহট্ট, কাছাড়, প্রভৃতি প্রদেশের প্রায় ২০ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দুকে বঙ্গীয় সমাজ হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে। এই বিংশতি লক্ষ হিন্দুকে এইরূপে বিনা অপরাধে, সমাজচ্যুত করিবার অধিকার কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আছে কি না, বঙ্গীয় সামাজিকেরা তাহার বিচার করিবেন।

এস্থলে আর একটি বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইতেছে। সামাজিক বাঙ্গালার বহির্ভাগে যে সকল বাঙ্গালী হিন্দু জীবিকার্জ্জন, বা তীর্থ-বাস বা জলবায়ুর পরিবর্ত্তন উপলক্ষে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের কথা বাঙ্গালী হিন্দুর বংশ-বিস্তার-বিষয়ক আলোচনা-কালে, কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ ভাবে বিস্মৃত হইয়াছেন, সেরূপ ভাবে বিস্মৃত হওয়া উচিত কি না? আমার মনে হয়, ঐ সকল প্রবাসী বাঙ্গালী যখন সামাজিক বঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দুর বংশধর ও আত্মীয়, তখন তাঁহারা প্রবাসে থাকিয়া চাকুরী, তীর্থবাস বা স্বাস্থ্যোন্নতি-সাধ

করিতেছেন বলিয়াই বাঙ্গালীর নিকট "মৃত" বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। মনে করুন, মধ্যবঙ্গের কোনও বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তিন পুত্র সারণ ও পাটনায় চাকুরী করিতেছেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুড়কী কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহার বাটীর ছইজন বিধবা কাশীধামে গিয়া বাস করিতেছেন। প্রথম বারে আদম সুমারীর সময়ে ইঁহারা সকলেই গৃহে থাকায় উক্ত ভদ্রলোকের পরিবারে সর্ব্বশুদ্ধ ১০ জন লোক পরিগণিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বারে লোক-গণনা-কালে তাঁহাদিগের মধ্যে ৬ জন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিদেশে থাকায় লোক-গণনা-কারীরা সেই ভদ্রলোকের গৃহে ৪ জনের অধিক লোক দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু এই জন্যই কি বলিতে হইবে যে, উক্ত ভদ্রলোকের বংশক্ষয় হইয়াছে? যদি এরূপ মনে করা অন্যায় হয়, তাহা হইলে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে, বাঙ্গালার বংশক্ষয়-বিষয়ক বিচার-কালে বাদ দেওয়াও দোষাবহ হইবে। এই কারণে আমি প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা সামাজিক বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যায় যোগ করা বিধেয় বলিয়া মনে করিতেছি। তাহা করিলে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে মোট বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায় :—

বাঙ্গালী হিন্দু।	বাঙ্গালী মুসলমান।
১,৮৬,১০,০০০	১,৮২,২৫,০০০
+৬,১০,০০০	+৩,২১,১৭৫
১,৯২,২০,০০০	১,৮৫,৪৬,১৭৫
—১,৮৫,৪৬,১৭৫	
৬,৭৩,৮২৫ হিন্দু অধিক।	

ইহাই আমার মতে, সামাজিক বাঙ্গালার ১৮৭২ অব্দের প্রথম লোক-গণনার যথাসম্ভব প্রকৃত ফল।

(৩)

১৮৮১ অব্দের লোক-গণনার ফল।

প্রথম বারের আদম-সুমারীর পর রাজপুরুষেরা খাস বাঙ্গালা বা "বেঙ্গল প্রপার" হইতে মালদহ, শ্রীহট্ট-কাছাড় ও কুচবিহার প্রভৃতি প্রদেশ অপসারিত করিয়া খাস বাঙ্গালার আয়তন খর্ব্ব করেন। গেট সাহেব তাঁহার সংশোধিত তালিকায় মালদহ ও কুচবিহারকে খাস বাঙ্গালার অধীন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সংকলিত তালিকায় মানভূম ও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের জন-সংখ্যা যোগ করিলেই আমাদের অভীপ্সিত সামগ্রিক বাঙ্গালার জন-সংখ্যা জানিতে পারা যাইবে :—

মিঃ গেটের গণনা-	হিন্দু	মুসলমান।
মতে সরকারি খাস বঙ্গে	১,৮০,৬৯,৩৫২	১,৮৫,৬৬,১১৭
মানভূম জেলায়	৯,৪৬,২৪৭	৭৫,৪৫৩
শ্রীহট্ট কাছাড়ে	১২,৪৫,০০০	১১,০৭,৯২৪
মোট	২,০২,৬০,৫৯৯	১,৯৭,৪৯,৪৯৪

১৮৯১ অব্দের আদম সুমারীর বিবরণী-লেখক ওডোনেল সাহেব অনুমান করেন যে, মুসলমান প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় বারের লোক-গণনা-কালে শতকরা তিনজন বা মোট প্রায় ২ লক্ষ ৮১ হাজার জন ভ্রম-ক্রমে বাদ পড়িয়াছিল। এই ভ্রান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও হিন্দু শতকরা ১ জনমাত্র বাদ পড়িয়াছিল ধরিয়া, বিভাগ করিলে ১৮৮১ অব্দের বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের জন সংখ্যা মূলতঃ এইরূপ দাঁড়াইতে পারে :—

হিন্দু	২,০৩,১৬,০০০	জন।
মুসলমান	১,৯৭,৫৭,০০০	"।

ইহার মধ্যে ভিন্ন-ভাষা-ভাষী বৈদেশিকদিগের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ছিল,—ঐ অব্দের আদম-সুমারীর ভাষা-বিষয়ক তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে ইহা জানিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের কিঞ্চিদ্‌ন

মুসলমান ও দুই তৃতীয়াংশের কিঞ্চিদধিক বিদেশী হিন্দু ছিল বলিয়া অনুমান করিলে প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায় :—

হিন্দু	১,৯২,৭৬,০০০
মুসলমান	১,৯২,৪২,০০০
	৩,৮৫,১৮,০০০

ভাগলপুর	বিভাগে	৩,২৪,০৭৭	জন
ছোটনাগপুর	,,	৯৮,৬৩৮	
উড়িষ্যা	,,	৪৮,৯৩৬	
পাটনা	,,	৩,৫৫৬	
আসাম প্রদেশে		৩,১১,২৭২	
ব্রহ্মদেশে		৯৯,৭৪৫	
উত্তর ভারতে		১৯,৩৫৯	
ভারতের অন্যান্য প্রদেশে		৩,৪৭৬	
সমগ্র ভারতে মোট		৩,৯৪,২৭,০৫:	

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠে উদ্ধৃত তালিকায় মুদ্রিত অঙ্কের সহিত এই অঙ্কের কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিল। ইহার একটি কারণ, ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারী-কালে পূর্ব্ব-বঙ্গ-প্রদেশের শতকরা তিন জন লোক গণনায় বাদ পড়িয়াছিল—তাহাদিগের সংখ্যা আমি ধরিয়াছি, সরকারি রিপোর্টে উহা ধরা হয় নাই। অপর কারণটি পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করা হইবে।

উল্লিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, ১৮৮১ অব্দে সামাজিক বঙ্গের বাহিরে প্রায় ৯ লক্ষ ৯ হাজার বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পূর্ণিয়া জেলায় স্বল্প-সংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানের বসতি। আসামের ও ব্রহ্মদেশের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যথাক্রমে অর্দ্ধেক ও তিন চতুর্থাংশ মুসলমান ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অন্য সর্ব্বত্র

বাঙ্গালী হিন্দুরই প্রাধান্য। এই তথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভাগ করিলে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায় :—

বাঙ্গালী হিন্দু	(১৮৮১ অঃ)	বাঙ্গালী মুসলমান।
১,৯২,৭৬,০০০		১,৯২,৪২,০০০
৬,৪৫ ০০০		+ ২,৬৪,১০০
১,৯৯,২১,০০০		১,৯৫,০৬,১০০
—১,৯৫,০৬,১০০		
৪,১৫,১০০ হিন্দু অধিক।		

পূর্ব্ব বারের তুলনায় হিন্দু বাড়িয়াছে—৭,০১,০০০ বা শতকরা ৩,৬৫
" " মুসলমান বাড়িয়াছে— ৯,৫৯,৯৬৫ " " ৫,১৮

ইহাই দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীর যথাসম্ভব প্রকৃত ফল।

প্রথমবারের লোক-গণনার ফলের সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীতে বাঙ্গালী হিন্দুর জন-সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। সংখ্যায় অল্প হইয়াও যে সময়ের মধ্যে মুসলমান কিঞ্চিদধিক ৯॥০ লক্ষ বাড়িয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে হিন্দু ৭ লক্ষ ১ হাজারের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা নিঃসন্দেহ বঙ্গীয় হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের লক্ষণ। কেন এরূপ হইল, এ প্রশ্ন সহজেই সকলের মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা। এই প্রশ্নের মীমাংসায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের মনে, কোন কুসংস্কার না থাকিলে, প্রথমেই এই সন্দেহের উদয় হইবে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় আদম সুমারীর মধ্যবর্ত্তীকালে অবশ্য কোনও আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনায় এককালে বহু-সংখ্যক হিন্দুর বিনাশ ঘটিয়াছিল; তাই হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। যাঁহারা ঐ সময়ের বাঙ্গালার ইতিহাসের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা হিন্দু-জন-সংখ্যার এই সামান্য হ্রাস দেখিয়া আদৌ বিস্মিত হইবেন না। যাঁহারা সে ইতিহাসের বিষয় অবগত নহেন, তাঁহারা আদম-সুমারীর বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারিবেন যে, প্রথম আদম-সুমারীর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের একটি সুবৃহৎ অংশে ম্যালেরিয়া সহসা মহামারিরূপে আবির্ভূত হইয়া ঐ প্রদেশের শতকরা গড়ে ৩ জন লোকের প্রাণনাশ করিয়াছিল। সেই প্রধান অংশের নাম বর্দ্ধমান বিভাগ। বর্দ্ধমান

বিভাগটি ১৮৭২ সালের পূর্ব্বে লোক-সংখ্যা হিসাবে খাস বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় ছিল। ঐ বিভাগে হিন্দুর সংখ্যাও অন্যান্য বিভাগের অনুপাতে অধিক ছিল। পক্ষান্তরে তথাকার সমগ্র জন-সংখ্যার এক সপ্তমাংশের অধিক লোক মুসলমান ছিল না। এই হিন্দু-বহুল সুবৃহৎ প্রদেশে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। ১৮৭২ সালে যখন প্রথম বার বাঙ্গালার আদম-সুমারী করা হয়, তখন বৰ্দ্ধমান বিভাগের বহু স্থানেই ঐ ম্যালেরিয়া উগ্র মহামারীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোক-সংহার করিতেছিল ; এবং উহা "দি গ্রেট বৰ্দ্ধমান-ফিবার" নামে রাজপুরুষদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিল। এই রোগে আক্রান্ত অনেক লোক রোগাক্রমণের পর ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন! তথাপি ১৮৭২ অব্দের গণনায় ঐ প্রদেশের জন-সংখ্যা ৭৬ লক্ষ ৪৷৹ সাড়ে চারি হাজারের অধিক হইয়াছিল। অন্যান্য বিভাগের জন-সংখ্যা তদপেক্ষাও কম ছিল। মহামারীর প্রাদুর্ভাব না হইলে বৰ্দ্ধমান-বিভাগের জন-সংখ্যা সেই সময়েই অন্যূন ৮৫ লক্ষ হইত, সন্দেহ নাই।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ (স্যানিটারি কমিশনার) মহাশয় যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, ঐ ভয়ঙ্কর মহামারীর জন্য এক বৰ্দ্ধমান জেলাতেই অন্যূন ৫ লক্ষ লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল! এই মহামারীর প্রবল প্রকোপ যদিও ১৮৭৪।৫ অব্দ হইতে বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, তথাপি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৩ বৎসরে বৰ্দ্ধমান বিভাগের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারীর সময় পর্য্যন্ত তাহার সবিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। দ্বিতীয় বারের লোকগণনা বিভাগের অধ্যক্ষ বোর্ডিলন সাহেব বলেন,—

It is true that this terrible epidemic did not claim so many victims in the decade which has elapsed since the census of 1872 as in that which preceded it, but the ravages of the desease have not yet been repaired, the ruined villages have not yet been rebuilt, jungle still flourishes where populous hamlets once stood, and while many of those who fled before the fever have not returned, the impaired powers of the survivors have not sufficed to fill the smiling land with a new population.—Census Report. Vol. I, p. 57.

"প্রথম বারের আদম-সুমারীর পূর্ব্ববর্ত্তী কয় বৎসরে বৰ্দ্ধমান বিভাগে মহামারীর

...যত লোক মরিয়াছিল, পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে যদিও সেরূপ মরে নাই সত্য, তথাপি মহামারীর অত্যাচারে এই প্রদেশের যে ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার পরিপূরণ হয় নাই; ধ্বংসাবশেষ গ্রামগুলি এখনও পুনর্নিম্মিত হয় নাই। পূর্ব্বে যেখানে মনুষ্য-বাস ছিল, এখনও তথায় বন-জঙ্গলের অতিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহারা মহামারীর পূর্ব্বে দেশ-ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা এখনও দেশে ফিরিয়া আসে নাই।"

এই মহামারীর জন্য বর্দ্ধমান বিভাগের জন-সংখ্যা প্রথম আদম-সুমারীর পরবর্ত্তী নয় বৎসরে কিরূপ হ্রাস পাইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

জেলার নাম	১৮৭২ খ্রীঃ	১৮৮১ খ্রীঃ	ফল।
বর্দ্ধমান	১৪,৮৩,৮৫০	১৩,৯১,৮২৩	— ৬.২
বীরভূম	৮,৫৩,৭৮৫	৭,৯৪,৪২৮	— ৬.৯৫
মেদিনীপুর	২৫,৪৫,১৭৯	২৫,১৭,৮০২	— ১.০৭
হুগলি	১১,৫৭,৩৮৫	১০,১২,৭৬৮	— ১২.৪৯
মোট	৬০,৪০,১৯৯ জন	৫৭,১৬,৮২১ জন	— ৫.৩৫

—৫৭,১৬,৮২১ "

৩,২৩,৩৭৮ জন

এখন বর্দ্ধমান বিভাগের যে দুইটি জেলায় মহামারী প্রবেশ করে নাই, সেই দুই জেলার জন-সংখ্যার প্রতি মনোনিবেশ করুন।—

জেলার নাম	১৮৭২ খ্রীঃ	১৮৮১ খ্রীঃ	ফল
বাঁকুড়া	৯,৬৮,৫৯৭	১০,৪১,৭৫২	+ ৭.৫৫
হাবড়া	৫,৯৫,৯৬৫	৬,৩৫,৩৮১	+ ৬.৬১
মোট	১৫,৬৪,৫৬২ জন	১৬,৭৭,১৩৩ জন	+ ৭.২

এই দুর্ঘটনায় হিন্দু-জাতির কিরূপ ক্ষতি হইল ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। মহামারীর প্রকোপ না হইলে বর্দ্ধমান বিভাগে অন্ততঃ শতকরা ৭ জন হিসাবে হিন্দুর জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারিত বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত বাঁকুড়া ও হাবড়া জেলায় মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়

নাই বলিয়া ঐ দুই জেলার জনসংখ্যা ঐ নয় বৎসরে যথাক্রমে শতকরা ৭।।০ ও ৬।।০ হিসাবে বাড়িয়াছিল, দেখা যায়। [প্রেসিডেন্সী বিভাগেও ঐ সময়ের মধ্যে শতকরা ৬ জনের অধিক জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।] এই হিসাবে যদি সমগ্র বৰ্দ্ধমান বিভাগের জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারীতে ঐ বিভাগের মহামারী-পীড়িত চারিটি জেলায় ৪ লক্ষ ২৩ হাজার জন লোক বৃদ্ধি পাইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না হইয়া প্রায় ৩ লক্ষ ২৩।০ হাজার জন কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং মোটের উপর ঐ এক বিভাগেই ৭ লক্ষ ৪৬ হাজারেরও অধিক লোক কমিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে মুসলমানের সংখ্যা সপ্তমাংশ বাদ দিলে মহামারীর জন্য হিন্দুর জন-সংখ্যায় ৬ লক্ষ ৩৯।।০ হাজারের ক্ষতি হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে। এই সংখ্যা হিন্দুর বৃদ্ধির অঙ্কে যুক্ত হইলে হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ মুসলমান অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ৩৬০ লক্ষ অধিক হইতে পারিত।

ইহাই হইল, প্রথম আদম-সুমারীর পরবর্ত্তী নয় বৎসরের হিসাব। কিন্তু বৰ্দ্ধমান বিভাগে মহামারীর সূত্রপাত হইয়াছিল—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। তদবধি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী দ্বাদশবর্ষে বৰ্দ্ধমান বিভাগে শুদ্ধ মহামারীর জন্য, মিঃ রিজ্‌লির নির্দ্দেশানুসারে, বিংশতি লক্ষ জন অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিল! এই ভীষণ জন-সংক্ষয় না ঘটিলে ১৮৮১ অব্দে আমরা হিন্দুর সংখ্যা অনেক অধিক দেখিতে পাইতাম। কিন্তু মহামারীর জন্য হিন্দুজাতি জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির সুযোগ হইতে দীর্ঘকালের জন্য বঞ্চিত হইল। 'দীর্ঘকালের জন্য' বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনায় যাহারা মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। মিঃ রিজলী বলেন, এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর বংশ-বিস্তার-শক্তি বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৮৯১ অব্দের লোক-গণনার ফল যে হিন্দুর পক্ষে সন্তোষ-জনক হয় নাই, মিঃ রিজলী নির্দ্দিষ্ট কারণটি তাহার অন্যতম।

(৪)

ভ্রান্ত মতের সমালোচনা।

দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীর সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা কিরূপ ছিল এবং হিন্দুর সংখ্যাই বা কেন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার আংশিক আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে পাঠক দেখিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত মহামারীর উৎপীড়ন-সত্ত্বেও ১৮৮১ অব্দে বাঙ্গালী মুসলমানের অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৫ হাজার অধিক ছিল। কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন, দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীর সময় বঙ্গীয় হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৬॥০ লক্ষ অধিক হইয়াছিল। তাঁহার উক্তি এই :—

"ইহার পরে ১৮৮১ সালে পুনরায় আদম-সুমারী গৃহীত (!) হয়। তাহাতে প্রকাশ পায়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৬৭ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৭৯ লক্ষে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৭১ লক্ষ হইতে এক কোটী সাড়ে বাহাত্তর লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ১৮৭২ সালের লোক-গণনায় মুসলমান অধিবাসীর অপেক্ষা হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা যে চারি লক্ষ অধিক ছিল, সেই আধিক্য বিলুপ্ত হইয়া বরং সাড়ে ছয় লক্ষ ন্যূন হইল। অর্থাৎ দশ (!) বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পক্ষান্তরে হিন্দুর সংখ্যা মোটে দেড় লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছিল।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমবারের আদম-সুমারীর পর রাজপুরুষেরা খাস বাঙ্গালা হইতে কয়েকটী জেলা বাদ দিয়া উহার আয়তন খর্ব্ব করেন। সেই খর্ব্বীকৃত বাঙ্গালার জন-সংখ্যার তালিকা ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ পুস্তকের ১৮শ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বিচারে সেই তালিকান্থিত অঙ্কগুলি স্বীয় পুস্তিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, প্রথমবারের আদম-সুমারীর যে সংখ্যা তিনি "ধ্বংসোন্মুখ জাতির" প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মালদহের অধিবাসীদিগের সংখ্যা নিবিষ্ট ছিল; কিন্তু দ্বিতীয়-বারের আদম-সুমারীর সময়ে ঐ জেলাটী খাস বাঙ্গালা হইতে অপসারিত ও ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং প্রথম বারের জন-সংখ্যার সহিত তুলনা করিতে হইলে, হয় প্রথম আদম-সুমারীর সংখ্যা হইতে মালদহের জন-সংখ্যা বাদ দিতে হইবে, না হয় দ্বিতীয়

বারের লোক-সংখ্যার অঙ্কে মালদহের জন-সংখ্যা যোগ করিতে হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ফল কিরূপ হয়, দেখুন :—

১৮৮১ অব্দে	হিন্দু	মুসলমান
সরকারী খাস বাঙ্গালায়	১,৭২,৫৪,১২০	১,৭৮,৬৩,৪১১
মালদহ জেলায়	+৩,৭৯,১৫৩	+৩,২৯,৫২৫
মোট	১,৭৬,৩২,২৭৩	১৮১,৯২,০৯৬
১৮৭২ অব্দের ফল	—১,৭১,১২,৯৮৪	—১৬৬,৮০,৬৪৩
	৫,২০,৩২৫	১৫,১২,২৯৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথম আদম-সুমারীর পর যে সময়ের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৫।০ লক্ষ বাড়িয়াছিল। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির অনুপাত ১ : ৩ ছিল। কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীর অঙ্কে মালদহের জন-সংখ্যা যোগ করিতে বিস্মৃত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের অনুপাতে বিষম প্রভেদ সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেখানে মুসলমানের বৃদ্ধির অঙ্ক হিন্দুর বৃদ্ধির দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল, সেখানে উহা ১॥ : ১২ বা হিন্দুর ৮ গুণ অধিকরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এইরূপে স্বকল্পনা-সৃষ্ট ভ্রম-জালে বিজড়িত হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় আতঙ্কে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং দেশবাসীকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছেন।

তৃতীয়বারের আদম-সুমারীর ফল বিচার-কালেও মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রকার ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত ১৮৮১ অব্দের অঙ্কে মালদহের জন-সংখ্যা যোগ করিলে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের অনুপাত লাঘব হইবে। অর্থাৎ অনুপাত স্থূলতঃ যেখানে ৭॥০ : ১৬ হইয়াছিল, সেখানে প্রকৃত পক্ষে ১১॥০ : ২০ হইবে।

শেষবারের গণনা-ফল-সংকলন কালে কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মালদহ জেলার অধিবাসীদিগকে বর্জ্জন করেন নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, কুচবিহার-বাসীকেও খাস বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই উদারতা প্রশংসনীয়,

সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের আদম-সুমারীর-বিষয়ে বিচার-কালে তিনি এরূপ উদারতা প্রকাশ না করায় তাঁহার তুলনা-মূলক মন্তব্য বা সিদ্ধান্তগুলি নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর উঠিয়াছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই ভ্রমের মূল কোথায়? তিনি প্রথম ও শেষবারের মনুষ্য-গণনা-ফলের সংকলন-কালে কেন মালদহবাসীকে খাস বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং কেনই বা দ্বিতীয় ও তৃতীয়-বারের ফল-বিচার-সময়ে ঐ জেলাটিকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রভৃতি বিষয়ের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে, মিঃ সি, জে, ওডোনেল সাহেবের লিখিত বিবরণের নির্ব্বিচারে অনুসরণ করিতে গিয়াই মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ গোল ঘটাইয়াছেন। রাজনীতিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, এই কথা ওডোনেল সাহেবই সর্ব্ব প্রথম প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। তদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রথমবারের জন-সংখ্যার সহিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের জন-সংখ্যার তুলনা-কালে তিনিই শেষোক্ত দুইবারের জন সংখ্যা হইতে মালদহ-বাসীদিগকে নীরবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের অনুপাতে কিরূপ গুরুতর প্রভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্ধভাবে ওডোনেল সাহেবের কুটিলতাপূর্ণ রচনার অনুসরণ না করিলে, "পর-প্রত্যয়নেয়-বুদ্ধি" না হইয়া তিনি কিঞ্চিৎ স্বাধীন-চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার সিদ্ধান্ত এতাদৃশ ভ্রমপূর্ণ হইত না। তিনি যদি গেট সাহেবের সংশোধিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার রচনায় ভ্রমের মাত্রা কম হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ওডোনেল সাহেবেরই কৌশলময়ী রচনায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত তথ্যের সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। ওডোনেল সাহেবের উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা পাঠক ১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারীর আলোচনা-কালে দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে কর্ণেল মহাশয়ের অনুষ্ঠিত অন্যান্য ভ্রম-প্রমাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারী সংক্রান্ত বিবরণী-গ্রন্থের ১৮শ পৃষ্ঠায় খর্ব্বীকৃত খাস বাঙ্গালার জন-গণনার যে ফল লিপিবদ্ধ আছে, কর্ণেল মহাশয় তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, তিনি ঐ ১৮শ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ নির্দ্দেশের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতেই পারেন নাই। ঐ পৃষ্ঠা হইতে তিনি হিন্দু-মুসলমানের যে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস, তাহা খাস বাঙ্গালার বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ঐ গ্রন্থেরই ২৮৪তম পৃষ্ঠার প্রান্তভাগে নেত্রপাত করিলে কর্ণেল মুখোপাধ্যায় দেখিতে পাইতেন যে, তথায় সে সময়কার খাস বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের মাতৃ-ভাষা-সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে।—

বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর	সংখ্যা	৩,৩৮,৯৯,৫৮৭
হিন্দী ও উর্দ্দূ ভাষীর	,,	৬,৫৯,৩৮৭
মারওয়াড়ী, গুজরাথী প্রভৃতি ভাষাভাষীর		২,০০৮
উড়িয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা		৪,৯৩,৯৫০
আরবী-পারসী-পস্তু-ভাষীর সংখ্যা		২,৮৭০
	মোট	৩,৫০,৫৭,৭৬২

আমরা এস্থলে "গারো" "মুরমী" "তেলেগু" "তামিল" প্রভৃতি অনার্য্য ভাষা-ভাষী হিন্দুদিগের সংখ্যা অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না। সে যাহা হউক, ঐ গ্রন্থেরই ১৮শ পৃষ্ঠার সংখ্যাগুলি এইরূপ :—

খাস বাঙ্গালায় হিন্দু	১,৭২,৫৪,১২০
,, ,, মুসলমান	১,৭৮,৬৩,৪১১

এই শেষোক্ত সংখ্যাগুলিই কর্ণেল মহাশয় স্বীয় পুস্তিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই সংখ্যাগুলি যে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা নহে, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাষা-বিষয়ক তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ণেল মহাশয়ের দৃষ্টি বোধ হয় ২৮৪তম পৃষ্ঠ-স্থিত ভাষা-বিষয়ক তালিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত না হওয়ায়, তিনি ১৮শ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত

সংখ্যাগুলিকেই বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বলিয়া মনে করিয়াছেন! বস্তুতঃ সেরূপ মনে করা ঘোরতর ভ্রম-মূলক। দ্বিতীয়তঃ তিনি মিঃ ওডে'নেলের অনুকরণে প্রথম বারের অপরিগণিত মুসলমানের সংখ্যাও হিসাবে ধরেন নাই।

১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারীর তালিকা মতে সরকারি খাস বাঙ্গালার বঙ্গ-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ৩,৩৮,৯৯,৫৮৭। কিন্তু ইহার মধ্যে কত হিন্দু ও কত মুসলমান, তাহার হিসাব আদম-সুমারীর বিবরণীতে কুত্রাপি প্রদর্শিত হয় নাই। অন্য দিকে বঙ্গদেশস্থ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহুসংখ্যক হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষ-ভাষী বিদেশী আছেন—তাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্যাদি উপলক্ষে বঙ্গদেশের নানাস্থানে অস্থায়ী ভাবে বসতি করিতেছেন। বিহার অঞ্চলের অনেক হিন্দু-মুসলমান খাস বাঙ্গালায় আছেন। ইঁহাদের মাতৃভাষা "বাঙ্গালা" নহে। কিন্তু ইঁহারা আদম-সুমারীর সময়ে বঙ্গদেশস্থ হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মোট সংখ্যা কত, তাহা আদম সুমারীর বিবরণীতে লিখিত থাকে বটে, কিন্তু এই সকল ভিন্ন-ভাষা-ভাষী বঙ্গ প্রবাসীর মধ্যে কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান, তাহার নির্দ্দেশ করা রাজপুরুষেরা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। অথচ তাঁহাদিগের সংখ্যা না জানিলে বাঙ্গালার বঙ্গভাষা-ভাষী হিন্দু বা মুসলমান কত, তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সংখ্যা-নির্ণয়ের জন্য কোনও প্রকার ক্লেশ-স্বীকার না করিয়া, আদম-সুমারীর তালিকা গ্রন্থের ১৮শ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সংখ্যাবলম্বনে হিন্দু-জাতিকে "ধ্বংসোন্মুখ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

আর এক কথা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, অখণ্ড বঙ্গের (বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, কুচবিহার ও ত্রিপুরার) মোট বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা হইতে খাস বাঙ্গালার মুসলমানের সংখ্যা বাদ দিলেই প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা পাওয়া যায়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোক-সংখ্যার বিষয়ে আলোচনা-কালে তিনি এই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন। এ পদ্ধতি যে দোষ-শূন্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি ১৮৮১ অব্দের বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা নির্ণয়-

কালে যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচার-পদ্ধতি, অন্ততঃ পক্ষে, অসামঞ্জস্য-দোষে দুষ্ট হইত না। কিন্তু কি কারণে জানি না, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জন-সংখ্যা-বিষয়ে আলোচনা-কালে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, ১৮৮১ অব্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে সে পদ্ধতির অবলম্বন করেন নাই। করিলে কিরূপ ফল হইত, দেখাইতেছি।—

আলোচ্য অব্দের আদম-সুমারীর তালিকার ৩০৪ পৃষ্ঠার প্রান্তভাগে সমগ্র বঙ্গের অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, ত্রিপুরা ও কুচবিহার প্রভৃতি প্রদেশস্থ বাঙ্গালা-ভাষীর মোট সংখ্যা ৩ কোটী ৬৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৭০ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সংখ্যা হইতে খাস বাঙ্গালার মুসলমানের সংখ্যা বাদ দেওয়া যাউক :—

৩,৬৪,১৬,৯৭০	সমগ্র বঙ্গের বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী।
—১,৭৮,৬৩,৪১১	খাস বাঙ্গালার মুসলমান।
১,৮৫,৫৩,৫৫৯	খাস বাঙ্গালার হিন্দু।

অর্থাৎ—

১,৮৫,৫৩,৫৫৯	বাঙ্গালা	হিন্দু।
—১,৭৮,৬৩,৪১১	,,	মুসলমান।
৬,৯০,১৪৮	জন অধিক হিন্দু।	

এইরূপে ১৯০১ অব্দের পদ্ধতি ১৮৮১ অব্দের বিচার-কালে প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় আদম-সুমারীর সময়ে মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯০ হাজারেরও অধিক ছিল। ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে হিন্দু জাতিকে মুমূর্ষু ভাবিয়া আতঙ্ক-গ্রস্ত হইবার কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় কেন উভয়ক্ষেত্রে এক পদ্ধতির অবলম্বন করিলেন না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন কি ?

সমগ্র বঙ্গের মোট বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা হইতে খাস বাঙ্গালার মুসলমানের সংখ্যা বাদ দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা-নির্দ্ধারণ-পদ্ধতিকে আমি দোষশূন্য মনে করি না। কারণ ঐরূপ করিলে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, খাস বাঙ্গালার

সকল মুসলমানই বঙ্গভাষাভাষী—তাহাদিগের মধ্যে হিন্দী বা উর্দ্দুভাষীর সংখ্যা আদৌ নাই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে বঙ্গায় মুসলমানগণের মধ্যে অনেক বিদেশাগত—আরবী, পারসী, পস্তু, হিন্দী ও উর্দ্দুভাষা-ভাষী লোক আছেন। ইহারা ব্যবসায়াদি উপলক্ষে অস্থায়িভাবে বঙ্গদেশে বাস করেন। বিহার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হিন্দী-ভাষা-ভাষী অনেক দরিদ্র মুসলমান বাঙ্গালার কলকারখানায়, পাট ও শস্যক্ষেত্রে, রেল ষ্টেশনে কুলী-মজুরের কার্য্য করে; অনেকে শকট-চালকের কার্য্য করিয়া বা অন্যরূপেও জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা সকলেই আদম-সুমারীর সময় খাস বাঙ্গালার বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা-বর্দ্ধনে সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দেই ময়মনসিংহের মুসলমানদিগের সংখ্যা বর্দ্ধনে ইহারা কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল, দেখুন,—

The collector reports that during the winter very large numbers of strangers from the N. W. P. and other parts of Bengal are attracted to the district in search of employment, remain there from October till May, so that they would all have been embraced in the Census held in Febraary.—Report of the Census of Bengal vol I. p. 45.

এই সকল বিদেশী মুসলমানের আগমনে ও অন্যবিধ আগন্তুক কারণে সেবার ময়মনসিংহের মুসলমান-সংখ্যা পূর্ব্ব আদম-সুমারীর অপেক্ষা প্রায় ৫ লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণ না ঘটিলে বোধ হয় বৃদ্ধির পরিমাণ দেড়লক্ষের অধিক হইত না। এই কারণে আদম-সুমারীর অধ্যক্ষ বোর্ডিলন সাহেব স্বীয় রিপোর্টের ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

In Mymensingh the increase is believed to be unreal, and it is probably due to the inclusion in the Census there of the many boatmen and labourers from other districts temporarily engaged in cutting and shipping the jute and rice crops.—p.81.

ইহা একবারকার ঘটনা নহে—প্রতি বৎসরই এইরূপ হয়, এখনও হইতেছে। ১৯০১ অব্দের আদমসুমারীর অধ্যক্ষ গেটসাহেবও ময়মন-সিংহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

Its emigrants to distant places are very few, but it receives large numbers of labourers from up country during the cold weather months, especially from the U. P. whose emigrants are more numerous here than in many districts.—Report of Bengal. pt. I p. 135.

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য অংশেও যোত্রহীন লোকের সদ্ভাব না থাকায় তত্রত্য পাটের ও ধান্যের ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য মুঙ্গের ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে তথায় বহু-কুলির আমদানি হইয়া থাকে, একথা আদম-সুমারীর শেষ রিপোর্টেও স্বীকৃত হইয়াছে। ময়মনসিংহের ন্যায়, মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানেও এই সকল বৈদেশিক কুলির মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াই সম্ভবপর। পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গেও বৈদেশিক মুসলমান কুলির ও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর অভাব নাই। ময়মনসিংহের তুলনায় বিচার করিলে মনে হয়, খাস-বাঙ্গালায় হিন্দীভাষী বৈদেশিক মুসলমানের সংখ্যা সে সময়ে অন্যূন ৫ লক্ষ ছিল। মোট বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা হইতে খাস বাঙ্গালার মুসলমানের সংখ্যা বাদ দিবার পূর্ব্বে, খাস বঙ্গের মুসলমানের সংখ্যা হইতে বৈদেশিক মুসলমানের সংখ্যা বাদ দেওয়া উচিত। নচেৎ বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা নির্ণীত হইতে পারে না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা না করায় তাঁহার পুস্তিকায় হিন্দুবাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

---

(৫)

বাঙ্গালী কাহাকে বলে ?

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অবলম্বিত বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা-নির্দ্ধারণ-পদ্ধতিকে দোষ-যুক্ত মনে করিবার আর একটি কারণ আছে। সে কারণের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু বলিতে কি বুঝায়, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—“বাঙ্গালী অর্থে যাহার মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালা”। কথাটা কি সঙ্গত ? বঙ্গদেশ যাহাদিগের পিতৃভূমি—যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিতেছে, বঙ্গ-জননীর ক্রোড় ভিন্ন অন্যত্র যাহাদিগের আশ্রয় নাই,—তাহাদিগকেই কি বাঙ্গালী বলা উচিত নহে ? বঙ্গদেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের অসংখ্য আদিম নিবাসী অনার্য্য-ভাষা-ভাষী লোকদিগকে “বাঙ্গালী” ভিন্ন আমরা আর কি বলিতে

পারি ? "বাঙ্গালী" পদটি বংশ-পরিচয়-জ্ঞাপক, না দেশ-পরিচয় জ্ঞাপক ? বিহারী, পঞ্জাবী, পেশওয়ারী, গুজরাথী, মান্দ্রাজী, নাগপুরী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি পদের দ্বারা যেমন ধর্ম্ম ও ভাষা-নির্ব্বিশেষে বিহারাদি দেশের অধিবাসীদিগকেই বুঝায়, বাঙ্গালী শব্দের দ্বারা সেইরূপ জাতি-ধর্ম্ম-ভাষা-নির্ব্বিশেষে বঙ্গবাসীকে বুঝাইবে না কেন ? পূর্ব্বোক্ত বঙ্গীয় অনার্য্যগণ হিন্দু মুসলমানের সাহচর্য্য ও চেষ্টায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা বাঙ্গালার আদম-সুমারীর বিবরণে সাধারণ মুসলমান-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমরা তাহাদিগকে "বাঙ্গালী মুসলমান" বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকি। এই কারণে, খাস বাঙ্গালার যে সকল আদিম নিবাসী হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাদিগের মাতৃ-ভাষা যাহাই হউক, আমরা তাহাদিগকে "বাঙ্গালী হিন্দু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য। মান্দ্রাজ অঞ্চলের ৪ কোটী অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় ভাষা-ভাষী লোককে যদি আমরা ভারতীয় হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি,—যদি পরলোকগত আনন্দ চার্লু মহোদয় দ্রাবিড়ীয়-ভাষ-ভাষী হইয়াও হিন্দুশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, তাহা হইলে খাস বাঙ্গালার আদিম নিবাসীরা হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াও, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহে না বলিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর তালিকা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন ? ফলকথা, প্রকৃত বঙ্গসন্তান যে ভাষা-ভাষীই হউক না কেন, অবলম্বিত ধর্ম্মানুসারে আমরা তাহাদিগকে বাঙ্গালী হিন্দু বা বাঙ্গালী মুসলমান বলিয়া গণনা করা সঙ্গত মনে করি।

কথাটা একটু পরিস্ফুট করিবার জন্য স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বপ্ন-লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে হইল :—

"ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে যে সকল অসভ্য বন্য জাতীয় লোক থাকে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে শান্ত, ত্যাগী, এবং নম্র-স্বভাব করিয়া তুলিতেছে। একটি উদাহরণ দিতেছি। ভারত সাম্রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত-সীমায় আসাম দেশে একটি প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশে প্রকৃত ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অপর কতকগুলি বন্য জাতীয় লোক বাস করে; তাহাদিগের নাম মিকি, আবর, গারো, নাগা, মিস্‌মি প্রভৃতি। আমি ঐ প্রদেশে গমন করিয়া দেখি, ঐ সকল জাতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আছেন এবং নিরন্তর অকৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রীতিভাজন হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ঋষির কুটীরে অতিথি হইলা তাঁহার কার্য দর্শন

করিলাম। তন্মধ্যে বিশেষ বর্ণনীয় ব্যাপার এই।—তিনি আপন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বজ্জদিগের গ্রাম মধ্যে গমন করেন, এবং উহাদিগের ক্ষেত্রাদি কর্ষণ কিরূপ হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়া যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেন। অনন্তর যদি কাহারও কোনও পীড়া হইয়া থাকে, তাহার চিকিৎসা করেন; পরে স্থূল স্থূল কথায় পরস্পরের মুখাপেক্ষিতা ও পরিণাম-দর্শিতার শিক্ষা দেন। কোন কোন বজ্জ ব্যক্তি প্রার্থনা করে, ঠাকুর আমাদিগকে মন্ত্র-দান করিয়া উচ্চ জাতীয় করুন। এরূপ প্রার্থনা নিরন্তরই হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অমন সকল স্থলে জল-সংস্কারাদি কোন বিধান দ্বারা কাহাকেও উচ্চ জাতীয় করেন না। তিনি বলেন, নীচ এবং অপকৃষ্ট ধর্ম্মক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ মনে করিলেই উচ্চ জাতীয় হইতে পারে না—তপস্যা করিতে হয়! এই বলিয়া বিশেষ বিশেষ তপশ্চরণ করিবার আদেশ দেন। কাহাকেও বলেন, তুমি বৎসরাবধি এই এই দ্রব্য খাইওনা—কাহাকেও বলেন, তুমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে, তাহার সিকি বা অর্দ্ধেক অন্যকে দান করিবে; কাহাকেও বলেন, তুমি প্রত্যহ একজন অতিথির সেবা করিয়া তবে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিবে। এইরূপ নানাবিধ উপায় দ্বারা ঐ সকল লোককে ইন্দ্রিয়-সংযম, লোভ-সংবরণ, পরোক্ষ-দর্শন প্রভৃতি পুণ্য-সম্পন্ন করা হয়। অনন্তর যে ব্যক্তি ঐ সকল আদেশ পালন-পূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাকে মন্ত্র দান করিয়া বলা হয়—"এক্ষণে তোমার ম্লেচ্ছত্ব গেল। তোমার দেয় পানীয় জলাদি আমার গ্রাহ্য হইল, এবং তোমার প্রদত্ত সামগ্রীতেও দেবপূজা করা যাইতে পারে। এক্ষণ অবধি যদি ঐ মন্ত্র-জপ-সহকারে এক বৎসর এই এই নিয়ম পালন কর, তবে তোমাকে আরও উন্নত জাতির মধ্যে লওয়া যাইতে পারিবে।" ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে এইরূপ করিয়াছিলেন। সংপ্রতি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতেও ঐ প্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিতেছেন।"

"ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বজ্জেরা সংস্কৃত হইয়া প্রথমে কোচ নাম প্রাপ্ত হয় অনন্তর পুনঃ সংস্কৃত হইলে তাহারা কলিতা নাম ধারণ করে। তৎপরে পুনর্ব্বার সংস্কার লাভ করিলে সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—প্রায়ই এক জন্মে পারে না, পরজন্মে পারে। অতি অন্ত্যজও ক্রমে ক্রমে সংস্কারপূত হইয়া সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। অনন্তর তাহার পুত্র তাদৃশ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্বেরও অধিকারী হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের সংস্কারের প্রণালী এইরূপ। ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাতঃ এই গুরুতর ক্লেশকর কার্য্যে প্রবৃত্ত। কোথাও কোথাও ভূম্যধিকারীরাও তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু অধিক স্থলে ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াই আপনাদিগের ধর্ম্ম-বিস্তার করিতেছেন।"

বৈদিক যুগের পর ঔপনিষদিক ও দার্শনিক যুগে এইরূপ সাত্ত্বিক ভাবেই ভারতের অসংখ্য অনার্য্য জাতির মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতের এই সংস্কার-প্রণালী বহুদিন হইতে পরাধীনতা-পীড়িত ভারতের ব্রাহ্মণ-সমাজের নিকট ভীতির কারণ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পরাধান দেশে সমাজ-হৃদয়ে একটা সঙ্কোচ ও ত্রস্ততার ভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। এই কারণে সমাজ আপনার অন্তর্নিহিত সমস্ত

ক্তিকে কার্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত বা ব্যক্ত করিতে সাহস হয় না। পরাধীনতায় সমাজের প্রাণ-শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হয়—মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বলতাবশতঃ আপনাদের জাতিত্ব-বিনাশের ভয় এত প্রবল হইয়া উঠে যে, সামাজিকেরা অন্যকে প্রশ্রয়-দানের চিন্তাকে মনেও স্থান দিতে পারেন না। কিন্তু ইদানীং বহুদিন হইতে আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে বলিয়াই কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অক্লান্ত চেষ্টায় যাহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিব ?

বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষেরা বন্য জাতিদিগকে হিন্দু সমাজের নিম্ন স্তরে আশ্রয় দান করিবার যে ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় নাই। বিগত ১৯০১ অব্দের বঙ্গীয় আদম-সুমারীর বিবরণ-লেখক গেট সাহেব বলেন,—

The way in which Hinduism is gradually attracting the non-Aryan tribes within its fold has often been discussed......Degraded members of the priestly caste wander amongst them in search of a livelihood. They commence by reading some religious books, and so gradually acquire an influence which often ends in their obtaining the position of spiritual adviser to the rude inhabitants of the village they have settled upon. In the Orissa States and the Chittagong Hill tracts, Vaishnva Bairagis more often than Brahmans act as missionaries of a debased (?) form of Hinduism.

In this way the tendency is spreading, amongst even the wilder tribes, to call themselves Hindus. Thus in Singhbhum, the Deputy Commissioner reports that some Hos style themselves Hindus and profess to believe in the Hindu Gods and Godesses. Some of them have taken to wearing the Brahmanical thread. In parts of the Chota Nagpur States certain Pans call themselves Das and set up as twiceborn Hindus and in Baramba many Khands and Savars who were returned as Animist in 1891, claimed that since then they had taken to Hindu forms of worship and were in consequence allowed to be classed as Hindus. In Mayurbhanj some Santals have accepted the ministration of Vaishnava preachers and now call themselves Hindus. One of the curious features of the movement inaugurated by the Kharwars or Santhal revivalists was their leaning towards Hinduism.—pp 152.

ভাবার্থ—বঙ্গদেশের অনেক অনার্য্য জাতিকে ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ

করিতে দেখা যাইতেছে। সাধারণতঃ শূদ্র-যাজী ব্রাহ্মণেরা ও বৈষ্ণবেরা (অধিকাংশ স্থলে বৈষ্ণব-মতাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা) অনার্য্য পল্লীতে গমন-পূর্ব্বক তত্রত্য অধিবাসীদিগকে হিন্দু-ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়িয়া শুনায় এবং ক্রমশঃ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া তাহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করে। তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টায় অতি অসভ্য বন্য জাতিরাও ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে। সিংহভূম অঞ্চলের "হো" নামক বন্য জাতির অনেকে উপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে! ছোটনাগপুরের পান-নামক অনার্য্য জাতি দ্বিজত্বের দাবী করিতেছে। খন্দ ও সাওয়ার জাতীয় লোকদিগকে পূর্ব্ববারের আদম-সুমারীর সময় এনিমিষ্ট বা ভূত-প্রেতের উপাসক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল; কিন্তু এবার তাহারা তদ্বিষয়ে আপত্তি করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া লেখাইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের অনেক গৌরবকামী সাঁওতাল বৈষ্ণবদিগের চেষ্টায় হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে খরওয়ারেরাই হিন্দুধর্ম্মের সমধিক পক্ষপাতী।

রিপোর্টের অন্য অংশে (১৫৩ ও ১৫৫ পৃষ্ঠায়) গেট সাহেব লিখিয়াছেন যে, সাঁওতাল পরগণার এক দশমাংশ, মালদহের দুই তৃতীয়াংশ ও দিনাজপুরের চতুর্থাংশের অধিক সাঁওতাল হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে। জলপাইগুড়ির "উরাওঁ"-নামক বন্য জাতির শতকরা ৯৯ জন হিন্দুত্ব-লাভ করিয়াছে। চট্টগ্রাম ও নেপাল অঞ্চলের অনেক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হিন্দুধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে হিন্দু রাজ-শক্তির সহায়তা না থাকা সত্ত্বেও এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, কিছুদিনের মধ্যেই তথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টাকে আপনার আসন ছাড়িয়া দিবে বলিয়া গেট সাহেবের বিশ্বাস। তাঁহার উক্তি এই,—

We have already seen how the non-Aryan tribes are gradually being enveloped in the folds of Hinduism. There is also a tendency on the part of this religion to grow at the expense of the small Buddhist population still surviving on the N. E. and S. E. outskirts of the Province......In Nepal the Hindu religion, backed up by the ruling dynasty, is steadily gaining ground. In the Chittagong Hill Tracts the contest is more even, but here too the victory will probably rest ultimately with the Bramhans.—p. 155.

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা অবিদিত নহে যে, নদীয়া জেলার গোস্বামী মহাশয়েরা আসাম ও মানভূমের ন্যায় দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া বন্য জাতীয় লোকদিগকে অহিংসা-মূলক সত্ত্ব-গুণ-প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। একথা আসামের আদম-সুমারীর বিবরণেও স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ বিবরণে ইহাও প্রকাশ যে, যাহারা একেবারে বন্য প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা প্রথমে শাক্ত-সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী গোসাঁইদিগের চেষ্টায় যে সকল বন্যজাতি আর্য্য ধর্ম্ম ও আর্য্য আচার গ্রহণ করিয়া হিন্দু সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহারা যুগযুগান্তর হইতে বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়াও ভাষার দোষে "বাঙ্গালী হিন্দু" বলিয়া পরিগণিত হইবে না, কিন্তু তাহাদিগেরই মধ্যে যাহারা মুসলমানের চেষ্টায় ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা "বাঙ্গালী মুসলমান" বলিয়া স্বীকৃত হইবে, ইহা কি ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা ? "হিন্দুত্ব" ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-সাপেক্ষ, না ভাষা-সাপেক্ষ ?

হিন্দুগণ বিজাতীয়ের মধ্যে স্বধর্ম্মের প্রচার করিয়া আপনাদের দল-পুষ্টির চেষ্টা করেন না বলিয়া, শিক্ষিত সমাজের নিকট নিন্দিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর চেষ্টায় যে সকল বন্যজাতি হিন্দুসমাজে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে, তাহাদিগকে অনার্য্য-ভাষী বলিয়া "বাঙ্গালী হিন্দুর" শ্রেণী হইতে বর্জ্জন করা কর্ণেল মুখার্জ্জির ন্যায় বিলাত ফেরৎ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে কি শোভন ও সঙ্গত হইতেছে ? তাই বলিতেছিলাম, বঙ্গদেশ যাহার পিতৃভূমি, সেই হিন্দুকে জাতি-ভাষা-নির্ব্বিশেষে "বাঙ্গালা হিন্দু" বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। এবিষয়ে আপত্তি করিলে ঘোরতর সংকীর্ণতা ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ করা হয়।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে অনার্য্য জাতির অসদ্ভাব নাই, একথা অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সুবিদিত। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ৺বঙ্কিম বাবু ঐ সকল জাতিকে "অনার্য্য বাঙ্গালী" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তখন কোচ জাতিকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি সম্পূর্ণ সম্মত

ছিলেন না। কিন্তু তাহার পর ত্রিশ বৎসর যাইতে না যাইতে কর্ণেল মুখোপাধ্যায় তাহাদিগকে বাঙ্গালী শ্রেণীতে স্থান দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ("হিন্দুসমাজ" ১ম খণ্ড ৪র্থ পৃঃ) ১৮৮১ অব্দের বঙ্গীয় আদম-সুমারীর বিবরণে বোর্ডিলন সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন—

The question of absorption is only one of time and opportunities. Many of the castes shown as low caste Hindus and now universally accepted as such, have peculiarities which gave rise to the suspicion that they are not pure Hindus of the Aryan type ; but they are to all intents and purposes low caste Hindus, and are treated as such without question. The class of semi-Hinduised aborigines are only a stage behind them in their progress towards Hinduism.—What many of the low caste Hindus once were the Semi-Hinduised aborigines are now, and in the lapse of time they too will recruit the ranks of the Hindus as intermarraige and social intercourse gradually obliterate more and more their distinctive characteristics.—141.

আমি যে সকল বঙ্গীয় অনার্য্য ও বন্যজাতির হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের কথা বলিতেছি, তাহাদিগের অনেকে হিন্দুধর্ম্মের সহিত আর্য্য-ভাষাও গ্রহণ করিতেছে, একথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সমগ্র বঙ্গে সাঁওতালের সংখ্যা প্রায় ১৮৷৷০ লক্ষ; তন্মধ্যে ১৭।০ লক্ষ জন সাঁওতালী ভাষায় কথা কহে—অবশিষ্ট প্রায় ১।০ লক্ষ সাঁওতাল আর্য্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ভিন্ন আরও চারি লক্ষাধিক হিন্দু সাঁওতাল আছে, তাহারা অদ্যাপি মাতৃ-ভাষা ত্যাগ করে নাই। দুই এক পুরুষ পরে অন্যান্য অনার্য্য বংশীয় হিন্দুর ন্যায় ইহারাও যে সম্পূর্ণভাবে আর্য্য ভাষা গ্রহণ করিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব? কোরা নামক আর একটি অনার্য্য জাতি আছে, তাহাদিগের সংখ্যা ৮৮ হাজার। ইহাদিগের মধ্যে ৮২ হাজার জন হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে—তন্মধ্যে ৬৫ হাজার জন আর্য্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে; অবশিষ্ট ১৭ হাজার জন এখনও আপনাদিগের মাতৃ-ভাষা পরিত্যাগ করে নাই। সুতরাং ২।১ পুরুষে সাঁওতালদিগেরও ভাষা-বিষয়ে কোরাদিগেরই মত উন্নতি হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। অধিকাংশ অনার্য্য হিন্দুর সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশের অনার্য্য বা বন্যজাতীয় হিন্দুদিগকে "বাঙ্গালী

হিন্দু” বলিয়া স্বীকার না করায় তাঁহার পুস্তিকায় “বাঙ্গালী হিন্দুর” সংখ্যা নিতান্ত কমিয়া গিয়াছে। নমঃশূদ্রদিগকে সমাজে উচ্চাধিকার দান করিবার আন্দোলন যখন চলিতেছে, তখন বন্য হিন্দুদিগকে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তর হইতেও অপসারিত করিবার চেষ্টা করা কখনও সমীচীন নহে।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চেষ্টায় খাস বাঙ্গালার কত অনার্য্য জাতি হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে, কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বোধ হয় তাহার সংবাদ রাখেন না। তিনি স্বীয় পুস্তিকার সপ্তম পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৩৫।৬) দুইটি ঘটনার যেরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার মতে হিন্দুর সান্নিধ্য-বশেই অনার্য্য জাতিসমূহের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুভাব প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,—

“এই হিন্দুয়ানীর বিস্তার একণে রুদ্ধ হইয়াছে। সমগ্র সাঁওতাল পরগণা এবং ছোটনাগপুর বিভাগ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারের সুন্দর (!) ক্ষেত্র বলিয়া মিশনরীদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এবং ঐ সকল লোককে যে ভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইতেছে,—তাহাতে অতি সত্বরই সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর বিভাগ—যাহা আয়তনে আসামের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং যুক্তবঙ্গের প্রায় তুল্য হইবে,—খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত জাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে গারো ও নাগেরাও খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত হইবে। ব্রাহ্মণেরা * * * কেহ ইহাদিগকে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বানও করেন না, কেহ প্রতিবন্ধকতাও করেন না।”

আদম-সুমারীর বিবরণী লেখক রাজপুরুষদিগের যে সকল উক্তি ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথার ঐক্য নাই। গেট সাহেবের তালিকায় প্রকাশ যে, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, আঙ্গুল ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বিগত ১৯০১ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ ছিল, যথা :—

১৮৮১ অঃ	৪৪,৯৯৮ জন,	বৃদ্ধির হার শতকরা
১৮৯১ অঃ	৯৬,৮৪৭ জন,	১২০.১ জন
১৯০১ অঃ	১,৫৬,৬৩৪ জন,	৬১.০৭ জন

স্বাভাবিক নিয়মে এই প্রদেশের খ্রীষ্টানদিগের যে বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত বিশাল ভূভাগে মিশনরী-দিগের চেষ্টায় বিগত ত্রিশ বৎসরে বা প্রকৃতপক্ষে ১৮৮১ অব্দ হইতে ১৯০১ অব্দ

পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৯০ হাজার জন খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে। ছোটনাগপুর বিভাগ ও সাঁওতাল পরগণার মোট জন-সংখ্যা ৬৭ লক্ষ ১০ হাজারেরও অধিক। তন্মধ্যে, এদেশে মিশনরী মহাশয়দিগের শুভ পদার্পণ-কাল হইতে বিগত ১৯০১ অব্দ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৫২৷৷০ হাজার জন মাত্র প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্ম্ম-তত্ত্বের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। এখনও অন্যূন ৬৫৷৷০ লক্ষ লোক ঐ প্রদেশে "অন্ধকারে" কাল যাপন করিতেছে। ইহারা কত দিনে মিশনরী মহাশয়দিগের অনুগ্রহে "আলোক"প্রাপ্ত হইয়া আলোচ্য প্রদেশকে অন্ধকার-শূন্য করিবে, গেট বাহাদুর বা অপর কোনও রাজপুরুষ তাহা গণনা করিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। বরং উদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে যে, আলোচ্য প্রদেশে খ্রীষ্টানের বৃদ্ধির হার, তৃতীয় ও চতুর্থ আদম-সুমারীর মধ্যবর্ত্তী কালে, পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের তুলনায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে! কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, অতঃপর "অতি সত্বরই সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর বিভাগ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত জাতি দ্বারা অধ্যুষিত হইবে।"

কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের গণনা-পদ্ধতি কিরূপ, তাহা অবগত নহি। গেট সাহেব-প্রমুখ রাজপুরুষেরা বলেন, আলোচ্য প্রদেশের বন্য জাতিসমূহের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি উত্তরোত্তর পক্ষপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, ঐ প্রদেশে "হিন্দুয়ানীর বিস্তার এক্ষণে রুদ্ধ হইয়াছে।" কোন্ তারিখ হইতে এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা তিনি অনুগ্রহ করিয়া জ্ঞাপন করিলে হিন্দুসমাজ উপকৃত হইত, সন্দেহ নাই। তাহার পর যে প্রদেশে ৯০ হাজার জনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ৩০ বৎসর লাগিয়াছে, সেই প্রদেশের অবশিষ্ট ৬৫৷৷০ লক্ষাধিক লোককে "অতি সত্বর" খ্রীষ্ট-ভক্ত করিয়া তুলিবার কিরূপ আয়োজন হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য হিন্দু-হিতৈষি-মাত্রেরই আগ্রহ জন্মিবার সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদিগের সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই; কেবল একটি ভীষণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া সাধারণের হৃদয়ে আতঙ্ক-সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অনার্য্য বংশীয় হিন্দুদিগের জন-সংখ্যা

(১৯০১ অব্দের আদম-সুমারী মতে।)

		বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী	সামাজিক বঙ্গে।	প্রধান বাসস্থানের নাম।
১।	আগারিয়া	১২,০০০	৪২৮	হাজারিবাগ, মানভূম।
২।	অসুর	১,০০০	৬৪৯	দার্জ্জিলিঙ্গ, পালামৌ।
৩।	উরাওঁ	১,৫৬,৩০০	১,১৬,৩৭৯	জলপাইগুড়ি, ছোটনাগপুর।
৪।	কন্ধ	৭৬,৬০০	৮৪৯	উড়িষ্যা।
৫।	কুর্ম্মী	৩,১৮,২০০	৪,০২,৮৬৮	ছোটনাগপুর। মানভূম।
৬।	কোরওয়া	৭,৯০০	১,৪৫৮	ঐ
৭।	কোরা	৮২,১৫০	৬৯,৬০৩	বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর।
৮।	খরওয়ার	১,০০,৪০০	৯,৯১০	রাজশাহী, পাটনা, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর।
৯।	খারিয়া	৪২,৩০০	১৮,০৪৮	মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, ছোটনাগপুর।
১০।	গারো	৭,৭০০	৭,৭৮৭	ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি।
১১।	গোণ্ড	১,৪৬,০৬০	৯৬১	উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, কাছাড়।
১২।	ঘাসী	৪৪,৪০০	১২,৪৯৭	যশোহর, জলপাইগুড়ি, ছোটনাগপুর।
১৩।	চিক	৪০,০০০	৮০৪	জলপাইগুড়ি, রাঁচী।
১৪।	তুরী	৪৫,৮৩০	১৪,৯৪৪	রাজশাহী, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর।
১৫।	তামড়িয়া	৫,০০০	১০৯	সিংহভূম, ২৪ পরগণা।
১৬।	নাগশিয়া	২৮,২৫০	২,৪৩০	রাজশাহী, ছোটনাগপুর।
১৭।	নেওয়ার	১০,৬৫০	৮,৫৯১	রাজশাহী।
১৮।	পান	৪,১৭,৮০০	১০,৭৫২	মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর।
১৯।	ভুইয়া	৬,৫৪,৪০০	১,০২,৩৭৯	পাটনা, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর।
২০।	ভুটিয়া	২,৫৬০	২,৫৬১	দার্জ্জিলিং। রাজশাহী।
২১।	ভূমিজ	৩,১৭,১০০	২,০২,৩১২	মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, বাঁকুড়া, মানভূম।
২২।	মগ	২৪০	২৩০	চট্টগ্রাম।
২৩।	মহলী	৫৩,০০০	১৫,২৫০	মেদিনীপুর, রাজশাহী, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর।
২৪।	মালপাহাড়িয়া	২৯,৩৫০	৫,০৪৩	রাজশাহী, সাঁওতাল পরগণা।
২৫।	মালে	১২,৫৭০	৮১৭	ভাগলপুর।
২৬।	মুণ্ডা	৮৫,৪০০	৫৬,৭২১	রাজশাহী, ২৪ পরগণা, ছোটনাগপুর।
২৭।	মুরমী	২,৫০০	১,৪৯২	রাজশাহী, সিকিম।
২৮।	মেচ	২১,০০০	২০,৮৫৮	জলপাইগুড়ি, কুচবিহার।
২৯।	সাঁওতাল	৫,৬৬,৫০০	২,৬০,২০১	বর্দ্ধমান, রাজশাহী, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর।
৩০।	হো	৪৮,৪০০	৭৮৬	ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা।
		৩২,১৫,৮৫০	২৬,০১,৩৬৫	

অনার্য্য হিন্দু ও খ্রীষ্টান।

খাস বাঙ্গালার কতিপয় অনার্য্যজাতির হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবৃদ্ধির হিসাব :—

	১৮৮১ অঃ	১৯০১ অঃ
	৫৮,৫৫২	১,৯২,৪৮৭
ভুইয়া	৩১,৫৪৩	৮৫ ৬৮২
খরওয়ার	৫,৬৯৮	৯,৭৯০
কোচ	১২,১৫,৩২১	২০,৬৫,৯৮২
সাঁওতাল	৩৬,৪০০	২,৪৫,৯৪১

এই বৃদ্ধির কিয়দংশ পূর্ব্ববারের গণনায় ভ্রান্তি-জনিত, কিয়দংশ অন্যপ্রদেশ হইতে সমাগত লোকের সংখ্যা-জনিত ও অবশিষ্টাংশ নবদীক্ষিত অনার্য্যগণের সংখ্যা-বৃদ্ধি-জনিত। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, ছোটনাগপুর হইতে যেমন অনেক অনার্য্য হিন্দু খাস বাঙ্গালায় নূতন আসিয়াছে, তেমনই আবার খাস বাঙ্গালা হইতে অনেকে আসামে কুলিরূপেও চালান হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণায় অনার্য্যবংশীয় সাঁওতাল, মালপাহাড়িয়া ও মহলীর সংখ্যা মোট ৭ লক্ষ। তন্মধ্যে এক লক্ষ দশ হাজার জন হিন্দুধর্ম্ম ও বিংশতি সহস্রজন আর্য্যভাষা অবলম্বন করিয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ প্রদেশে মোট দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা কিঞ্চিন্ন্যূন ৯॥০ হাজার। ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অনার্য্যবংশীয় লোকের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৮ হাজার হইতে পারে। ঐ প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের ভবিষ্যৎ কিরূপ উজ্জ্বল, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

ছোটনাগপুর অঞ্চলে কুর্ম্মী চিক ও ভূমিজদিগের সংখ্যা বাদেও ৭ লক্ষ ৬৭॥০ হাজার অনার্য্য হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। ঐ প্রদেশে সর্ব্বজাতীয় দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২৸০ হাজারের অধিক নহে। মুণ্ডাদিগের মধ্যে ৮৫॥০ হাজার জন হিন্দু হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্টানের সংখ্যা ৫৫॥০ হাজার। হিন্দু মুণ্ডাদিগের অনেকেই আর্য্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। খরওয়ারেরা সাঁওতাল হইতে ক্ষত্রিয়ত্বে পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছে।

(৬)

জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ।

বলিয়াছি, ১৮৮১ অব্দের খর্ব্বায়তন বঙ্গের আদম-সুমারীর তালিকায় হিন্দু-মুসলমানের যে সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম মুখোপাধ্যায় মহাশয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ঐ সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুর বংশক্ষয়ের কল্পনা করা বা মুসলমানের অতিরিক্ত বংশ-বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থাপন করা কিরূপ অসঙ্গত, তাহাও দেখাইয়াছি। হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা-নির্ণয়ের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও দোষশূন্য নহে। বাঙ্গালী হিন্দুর সংজ্ঞা-নির্ণয় বিষয়েও তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। দেশের বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি কি কি কারণে ঘটিতে পারে এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় তাহা দেশের বা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ের বিচার না করিলে, অনেক স্থলেই জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিয়া মনে অকারণ হর্ষামর্ষের উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে সেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আমি বঙ্গদেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি,—

১ম—জন্ম-সংখ্যার হ্রাস,

২য়—মৃত্যু-সংখ্যার বৃদ্ধি,

৩য়—তীর্থবাস, চাকুরি বা জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের বিদেশ-গমন,

৪র্থ—গণনার ভ্রান্তি,

৫ম—কোনও কারণে বিদেশাগত হিন্দু বা মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধি,—

এই পাঁচটি কারণে প্রধানতঃ দেশের হিন্দু-জন-সংখ্যা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। তন্মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ কারণে দেশের জন-সংখ্যা হ্রাস পাইলে, তাহা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ, উহা দ্বারা সমাজের বংশক্ষয় বা জননী-শক্তির অভাব বা হ্রাস প্রতিপন্ন হয় না।

বাঙ্গালী হিন্দু প্রধানতঃ চাকুরিজীবী,—চাকুরির জন্য বাঙ্গালী যাইতে পারে না, ভারতে এমন স্থান অল্প। অন্যরূপে জীবিকার্জ্জনের জন্যও অনেক বাঙ্গালীকে প্রবাসে জীবন-যাপন করিতে হয়। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-প্রাণতাও সামান্য নহে—ভারতে তীর্থ-স্থানেরও অভাব নাই। সুতরাং বারাণসী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, গয়া, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বাঙ্গালী হিন্দু গমন করে—অনেকে তথায় থাকিয়া জীবনের শেষাংশ যাপন করিয়া থাকে। এইরূপে যে সকল বাঙ্গালী হিন্দু খাস বাঙ্গালার বাহিরে নানা স্থানে বাস করে, তাহাদের সহিত সামাজিক বাঙ্গালার লোকে নানা সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালীর বংশ-বিস্তারের বা বংশ-ক্ষয়ের বিচারকালে এই সকল প্রবাসী বাঙ্গালী বংশধর-দিগের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। যে সকল কারণে বাঙ্গালী হিন্দু বিদেশে গমন করে, সে সকল কারণ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বিদ্যমান নাই, এ কথা আদম-সুমারীর কর্ত্তৃপক্ষকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম এক ব্রহ্মদেশ ভিন্ন আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক মুসলমান জীবিকার্জ্জনের জন্য ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া থাকে। বিগত কয়েক-বারের আদম-সুমারীসমূহের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, প্রতি বৎসরই বিদেশগামী বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে—রেল পথের বিস্তারের সহিত বাঙ্গালী হিন্দু চাকুরী, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন ও তীর্থবাস উপলক্ষে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় বিদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ব্রহ্মদেশেও বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুর তুলনায় তাঁহাদিগের সংখ্যা অনেক কম। উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী হিন্দুর বিদেশ-গমনে সামাজিক বাঙ্গালার হিন্দু-সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইবার কথা। এইরূপ সংখ্যা-হ্রাস সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। দুঃখের বিষয়, কর্ণেল মুখোপাধ্যায় এই তত্ত্বের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। তিনি এক দিকে যেমন মালদহ, মানভূম, কুচবিহার, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের হিন্দু বাঙ্গালীদিগকে বঙ্গীয় সমাজ হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন, অন্য দিকে সেইরূপ প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন।

চতুর্থ কারণে বা গণনায় ভ্রান্তি-হেতু অনেক সময়ে হিন্দুর সংখ্যা আদম-

সুমারীর তালিকায় হ্রাস পাইয়া থাকে। কারণ, কে হিন্দু, কে হিন্দু নয়, অথবা কাহাকে হিন্দু বলা উচিত, কাহাকে বলা উচিত নহে, তাহা গণনাকারী রাজ-পুরুষেরা অনেক সময়েই স্থির করিতে পারেন না। এ বিষয়ে আদম-সুমারীর বিবরণীতে রাজপুরুষদিগের অনেক কৌতুককর গবেষণা ও মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা ভূত-প্রেতের পূজা দেয়, এমন অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু রাজপুরুষদিগের কল্যাণে "এনিমিষ্ট" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অনেক বন্য জাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও সরকারী গণনাকারীদিগের নিকট হিন্দু বলিয়া গণ্য হয় না। ইহারা আচারে ব্যবহারে, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য-স্বীকার-বিষয়ে ও পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসনায় বহু পরিমাণে প্রকৃত হিন্দুর মত হইলেও কোন কোনও রাজপুরুষ ইহাদিগকে হিন্দুশ্রেণীতে স্থান দান করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ ইহাদিগকে "হিন্দু" বলিয়া গণনা করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। এইরূপ মতভেদের ফলে দেখা যায় যে, যাহারা একবার-কার আদম-সুমারীতে "হিন্দু" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহারাই পরবারে "এনিমিষ্ট" নামে অভিহিত হইয়া হিন্দু শ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইতেছে। রাজ-পুরুষদিগের এইরূপ খেয়ালের জন্য হিন্দুর সংখ্যার কখনও হ্রাস কখনও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৮৮১অব্দে এইরূপ কারণে হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস না হইলেও, ১৮৯১ অব্দে বিলক্ষণ হইয়াছিল।

গণনায় ভ্রান্তি আর এক কারণে হইতে পারে। যদি কোনও প্রদেশের একাংশের জন-সমূহের গণনা-কার্য্য প্রথম বারের আদম-সুমারীর সময় না হইয়া থাকে ও দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীর সময়ে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সহসা ঐ প্রদেশের জন-সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া লোকের ভ্রম জন্মে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ খাস বাঙ্গালার মুসলমান-প্রধান কোনও কোনও স্থানের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। কাজেই কর্ণেল মুখো-পাধ্যায়ের ন্যায় অসম্যগ্‌দর্শী লোকের ধারণা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীতে খাস বাঙ্গালার মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারী বিভাগের অধ্যক্ষ বোর্ডিলন সাহেবও লিখিয়াছিলেন,—

It is not to be supposed that the whole of this increase represents an advance in the actual numbers of population. Some of it, necessarily an indifinite quantity, is due to the more elaborate arrangements made for the present Census, and to the greater accuracy with which it was taken; and thus it means not that there were 6,831,143 more persons living in Bengal in 1881 than there were in 1872, but that of that number, while the great majority were now arrival in Bengal either by birth or immigration, a certain number were persons who although actually living in Bengal in 1872, escaped by some means or other enumeration at the census of that year.

Mr. Beverly himself would be the last to assert that his enumeration was faultless; and in fact the local enquiries which preceded the taking of the present census, disclosed many cases of omission—sometimes of whole villages, sometimes of individuals or isolated families.—p. 41.

এখন সামাজিক বাঙ্গালার মুসলমান-প্রধান কোনও কোনও স্থানে যে এইরূপ গোল ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি। ১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারীর অধ্যক্ষ ওডোনেল সাহেব স্বীয় রিপোর্টের ৭৩ পৃষ্ঠায় ময়মনসিংহ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

The census returns show that the population of Maimansingh has increased by over a million in nineteen years, but there is no doubt but the returns of 1871 were very deficient, and that probably hundreds of thousands were omitted in that year.

অর্থাৎ ১৮৭২ অব্দের আদম-সুমারীর সময়ে ময়মনসিংহের অনেক স্থানে লোক-গণনা-কার্য্য আদৌ সম্পন্ন হয় নাই। সম্ভবতঃ কয়েক লক্ষ লোকই সেবারকার জন-গণনায় বাদ পড়িয়াছিল। এই কারণে বিগত ১৯ বৎসরে ময়মনসিংহ জেলায় যে দশ লক্ষাধিক লোকের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ নহে। ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারীর সময়ে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর লিখিয়াছিলেন,—

It is notorious that the census of 1872 was anything but correctly taken, especially in the outlying portions of the district.—Report of the Census of Bengal 1881. p. 45.

বাখরগঞ্জ সম্বন্ধেও সেইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়।—

The Magistrate also sees reasons to doubt the accuracy of the census of 72.—Report of the census of Bengal 1891. p. 79.

এখন নোয়াখালির অবস্থা শ্রবণ করুন—

After making every allowance for the great fecundity of a prosperous Musalman population, remembering that the district loses rather than gains by emigration, it is impossible not to think that a large part of the increase of population must be attributed to more thorough counting of the inhabitants than was had in 1881. Noakhali is a very difficult tract to census.—*Ibid* p. 8.

১৮৮১ অব্দের আদমসুমারীতেই যখন নোয়াখালির অনেক লোক গণনায় বাদ পড়িয়াছিল, তখন ১৮৭২ অব্দে যে বাদের পরিমাণ আরও অধিক ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান-প্রধান চট্টগ্রামে, যশোহরে ও মুর্শিদাবাদের অংশবিশেষে প্রথমবারের জনগণনায় অনেক লোক বাদ পড়িয়াছিল। (Census of India Vol. I. 49.—Do. Bengal. pp 50 and 80.)

ফলকথা, প্রথমবারে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক মুসলমান-প্রধান স্থানেই লোক-গণনার সুব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই—১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারীর সময়েও অনেক লোক ভ্রম-ক্রমে বাদ পড়িয়াছিল। ১৮৯১ অব্দে ওডোনেল বাহাদুর অনুমান করেন যে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীতে শতকরা ৩ জন লোক বাদ পড়িয়া থাকিবে। (৬৮ পৃঃ) প্রথম বারে কত বাদ পড়িয়াছিল, কে বলিবে? বিশেষতঃ মুসলমান-সমাজে অবরোধ-প্রথার আধিক্য-বশতঃ ঐ সমাজের অনেক স্ত্রীলোকেই যে প্রথম দুই বারের গণনা-কালে বাদ পড়িয়া থাকিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৯১ অব্দ হইতে লোক-গণনার সবিশেষ সুব্যবস্থা করা হয়। প্রথম বারের অপেক্ষায় দ্বিতীয় বারে গণনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। কাজেই উত্তরোত্তর মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই বৃদ্ধির কিয়দংশ পূর্ব্ববর্ণিত গণনার ভ্রম-বশতঃ ঘটিয়াছিল ও কিয়দংশ বৈদেশিক মুসলমান কুলি-মজুরের খাস বাঙ্গালায় সাময়িক উপস্থিতির জন্য ঘটিয়াছিল। সুতরাং কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মুসলমান-সংখ্যার যে বৃদ্ধির হার দেখিয়া ভীত হইয়াছেন, সে বৃদ্ধি সর্ব্বাংশে প্রকৃত বংশ-বিস্তার-জনিত নহে—উহা পূর্ব্ববারের গণনার ভ্রান্তি ও বৈদেশিকগণের সাময়িক উপস্থিতি-বশতই হইয়াছে। শেষোক্ত ঘটনাকে আমি "৫ম কারণ"

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সে বিষয়ে অধিক আলোচনা করিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই—ইতঃপূর্ব্বে চতুর্থ পরিচ্ছদে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বুদ্ধিমান পাঠক প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় কারণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দৃষ্ট হয় যে, মুসলমানের জন্ম-সংখ্যার অনুপাত হিন্দুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবার সম্ভাবনা। কারণ, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরেও বিধবা-বিবাহের প্রচার অল্প। ফলে অনেক গর্ভ-ধারণ-ক্ষমা হিন্দু-রমণীকে নিঃসন্তান থাকিতে হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে "নিকা" করিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহাদিগের বংশ-বৃদ্ধি হিন্দুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। "কিঞ্চিৎ অধিক" বলিবার কারণ এই যে, নিকা করিবার অধিকার থাকিলেও সকল মুসলমান-বিধবার ভাগ্যে "নিকা" ঘটিয়া উঠে না। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন,—মুসলমান-সমাজে ১০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন বিধবা আছে; হিন্দুসমাজে ঐ দুই বয়সের মধ্যে বিধবার সংখ্যা শতকরা ৪৮ জন।" তাঁহার মতে বিধবা-বিবাহের জন্য মুসলমান সমাজে অধিক বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, "এ কথাটি একেবারে অমূলক নহে;" তথাপি "ঐ কারণে যে বৃদ্ধি হয়," তাহা তাঁহার মতে "অতি সামান্য।" তাঁহার এই অনুমান অ... যথার্থ।

বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে সন্তানোৎপত্তির হার মুসলমান সমাজের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজে সন্তানোৎপত্তির হার দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, এ কথা প্রতিপন্ন করা সহজসাধ্য নহে। সরকারি জন্ম-মৃত্যু-বিষয়ক বার্ষিক-তালিকায় এবিষয়ের কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। তবে আদম-শুমারীর অঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, বিবাহের বয়স-বৃদ্ধির সহিত হিন্দুসমাজে দিন দিন বাল-বিধবার সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে—পূর্ব্বে যত রমণী বিধবা হইতেন, এখন আর তত হন না। এইরূপে সধবার সংখ্যা-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহ বংশ-বৃদ্ধির অনুকূল। সুতরাং হিন্দুসমাজে দিন দিন জন্ম-সংখ্যার হ্রাস হইতেছে, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না বলিয়াই আমার মনে হয়। সরকারি মৃত্যু-তালিকায় মনোযোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মুসলমান অপেক্ষা সাধারণতঃ হিন্দু অধিকতর

দীর্ঘজীবী—মুসলমানের মৃত্যুর হার অনেক স্থলে হিন্দুর অপেক্ষা অধিক। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাইবে।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি কারণ ব্যতীত আর একটি কারণে দেশের জন-সংখ্যা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। সেই ৬ষ্ঠ কারণকে আমি আধিদৈবিক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। এই শেষোক্ত কারণে যদি কোনও সমাজের বহুসংখ্যক লোক সহসা কালগ্রাসে পতিত হয় ও তাহার ফলে যদি সেই সমাজের জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির পথে কিয়ৎকালের জন্য বাধা ঘটে, তাহা হইলে সেই সমাজের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশঙ্কাযুক্ত হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সাময়িক আগন্তুক কারণের ফলও কখনও স্থায়িভাবে অশুভকর হয় না—সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই বোধ হয়, একথা স্বীকার করিবেন।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রথম আদম-সুমারীর পরবর্ত্তী নয় বৎসরে বাঙ্গালা হিন্দুর সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দশ বৎসরে উহা ৭৷৷০ লক্ষ বৃদ্ধি পায় ও তাহার পর দশ বর্ষে ১৪ লক্ষ বাড়ে। আমি তর্কস্থলে তাঁহার হিসাবই ভ্রমশূন্য বলিয়া মানিয়া লইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—“এরূপ হইল কেন? প্রথম ৯ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক বাড়িল না কেন? আবার পরবর্ত্তী দশ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা হঠাৎ ৭৷৷০ লক্ষ ও তাহার পর ঐ সময়ের মধ্যে একবারে ১৪ লক্ষ বাড়িল কিরূপে? কর্ণেল মুখোপাধ্যায় স্বীয় প্রায়-শত-পৃষ্ঠব্যাপী পুস্তকের কুত্রাপি এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয়, এ প্রশ্ন তাঁহার নির্ব্বিকার চিত্তে আদৌ উদিত হয় নাই। কিন্তু তিনি যদি কিঞ্চিৎ ধীরতার সহিত আদম-সুমারীর বিবরণে মনোযোগ করিতেন, তাহা হইলে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ মহামারীর ইতিহাস তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইত এবং তিনি হিন্দুর সেই আধিদৈবিক বিপদকে “ক্ষয়রোগ” নামে অভিহিত করিতে সাহসী হইতেন না।

বর্দ্ধমানের ন্যায় সুবৃহৎ বিভাগে সেবার যেরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেরূপ ঘটনা সাধারণতঃ সকল সময়ে ঘটে না। যেখানে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঘটে, সেখানে জাতীয় অস্তিত্ব বিলোপাশঙ্কা নিশ্চিত প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্গীয়

হিন্দুপ্রধান প্রদেশসমূহে বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সেরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দৈব আর ঘটে নাই। সুতরাং হিন্দু পূর্ব্বের ক্ষতি-পূরণ করিয়া আবার বংশবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। মুসলমান-প্রধান কোনও. সুবৃহৎ বিভাগে যদি ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে মুসলমানের সংখ্যাও বহুলরূপে কমিয়া যাইত এবং সেই ক্ষতির পূরণ করিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহাদিগকেও কিছু দিন হিন্দুর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইত।

কিন্তু এইরূপ গুরুতর দুর্দৈব-ঝটিকার আঘাত সহ্য করিয়াও হিন্দু জীবন-সংগ্রামের পথে যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। হিন্দুর সংখ্যা প্রথম দশ বৎসরে ৭॥০ লক্ষ ও পরবর্ত্তী দশ বৎসরে ১৪ লক্ষ বাড়িয়াছে বলিয়া কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ই সাক্ষ্য দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি হিন্দু জাতির ধ্বংসপথে অগ্রসর হইবার লক্ষণ ?

---

(৭)

১৮৯১ অব্দের লোক-গণনা।

তৃতীয় বারে বা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের লোকগণনা-কার্য্য পূর্ব্ব দুইবারের অপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। মিঃ সি, জে, ওডোনেল সেবার আদম-সুমারীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি লোক-গণনার যে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহাতে হিন্দুর সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে ও মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ১৮৮১ অব্দে বোর্ডিলন সাহেব সমগ্র বাঙ্গালার জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির ফল-সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

There are now therefore in every 100 of the population nearly two more Hindus than they were in 1872: The proportion of Mohomedan is greater by two in 10,000; of Christian by four in 10,000 and of the Buddhists by one in a thousand; while the class of All Others has lost 61 in a thousand.—p. 76.

অর্থাৎ পূর্ব্ববারের আদম-সুমারীর পর হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ২ জন হিসাবে, মুসলমানের প্রতিদশ হাজারে ২ জন হিসাবে, খ্রীষ্টানের ৪ জন হিসাবে, বৌদ্ধদের

হাজার করা ১ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; পক্ষান্তরে বন্যজাতিসমূহের সংখ্যা হাজার করা ৬১ জন কমিয়া গিয়াছে। হিন্দুর এইরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ যে, ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম-প্রচার-তৎপরতা, তাহা বোর্ডিলন সাহেবের মন্তব্যের শেষাংশে বা অনার্য্য বন্য জাতিসমূহের সংখ্যাহ্রাসের পরিমাণে মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বোর্ডিলন বাহাদুরও লিখিয়াছেন,—

The greater part of this advance is due to the entry of many persons in the census schedules as Hindus who at the census of 1872 were classed as aboriginals.—p. 77.

সিংহভূম, মানভূম, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, কুচবিহার, সাঁওতাল-পরগণা ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহে ব্রাহ্মণের চেষ্টায় বহুসংখ্যক বন্য-জাতীয় লোক যে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা আদম-সুমারীর তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। উদাহরণ স্বরূপ মানভূম জেলার জন-সংখ্যার তারতম্যে দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৭২ অব্দে ঐ জেলায় প্রায় ৮ লক্ষ ২৮ হাজার হিন্দু ছিল, কিন্তু ১৮৮১ অব্দের গণনায় তথায় ৯ লক্ষ ৪৬।০ হাজার বা একলক্ষ ১৮ হাজার অধিক হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। বংশবৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়মে ঐ নয় বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা ত্রিশ সহস্রের অধিক বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অতিরিক্ত প্রায় ৮০ হাজার হিন্দুই নবদীক্ষিত। ইহার কিয়দংশ পূর্ব্ব গণনায় বাদ পড়িয়া থাকিতে পারে। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা ঐ প্রদেশের বন্য জাতিসমূহকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদিগের প্রধান ব্যক্তিদিগকে ক্ষত্রিয়ত্ব দান করিয়া গৌরবান্বিত করায় ও তাহাদিগের পুরাতন দেবতাসমূহকে আপনাদিগের "তেত্রিশ কোটির" মধ্যে আসন দান করায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ স্বভাবতই অধিক দেখা যায়। এইরূপ ঘটনা যে, কেবল বঙ্গদেশেই ঘটিতেছে, তাহা নহে; উড়িষ্যায় মধ্যভারতে ও বোম্বাই প্রদেশেও এইরূপ হিন্দুধর্ম্ম-বিস্তার-কার্য্যের বিরাম নাই। বোর্ডিলন বাহাদুর ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ-পুস্তকের ৭৭।৭৮ পৃষ্ঠায় এই ব্যাপারের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ

করিয়া দেখিতে পারেন। ঐ সময়ে সাঁওতালদিগের মধ্যে ২ লক্ষ ৩।০ হাজার জন ও কোলদিগের মধ্যে ২ লক্ষ ৫৭৸০ হাজার জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল, ইহাও বোর্ডিলন সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক খ্রীষ্টান লেখকের নিকট ইহা প্রীতিকর ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। কুটিল ব্রাহ্মণের ফাঁদে পড়িয়া এই সকল বন্য জাতি আপনাদিগের অসভ্য আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতেছে এবং খ্রীষ্টান না হইয়াও বৈদেশিক খ্রীষ্টীয় সভ্যতার অনুকারী না হইয়া প্রতিবেশী হিন্দুসভ্যতার আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক হিন্দুর জন-শক্তির বর্দ্ধনে সহায়তা করিতেছে, ইহা অনেকের নিকট অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবার কথা। মিশনরীরা ত্রিশবৎসর কাল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সাঁওতাল পরগণা ও সমগ্র ছোটনাগপুরে বিশাল জনসমূহের মধ্যে ৯০ হাজারের অধিক লোককে খ্রীষ্টান করিতে পারিলেন না, আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ এক ক্ষুদ্র মানভূম জেলাতেই প্রায় ৮০ হাজার বন্য জাতীয়কে হিন্দু করিয়া ফেলিল, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় ? ইহার পর, নূতন রেল-বিস্তারের সহিত দেশের দুর্গম স্থানসমূহে যাতায়াতের পথ যতই সুগম হইবে, ততই ব্রাহ্মণের এই অত্যাচার বৃদ্ধি পাইবে! ইহা কি সহ্য হয় ? এইরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, আর অন্য যে কারণেই হউক, সিবিলিয়ান ওডোনেল বাহাদুর ১৮৯১ অব্দে ব্যবস্থা করিলেন যে, নবদীক্ষিত বন্যজাতিদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় আর হিন্দু বলিয়া গণ্য করা হইবে না!—তাহারা "এনিমিষ্টিক" এই সম্পূর্ণ নূতন নামে অভিহিত হইবে। এই অভিনব গণনা-পদ্ধতির ফলে সমগ্র বঙ্গদেশের হিন্দু-সংখ্যা হাজারকরা ১২৯ জন কমিয়া গেল! অবশ্য মুসলমানেরা ও মিশনরীরা যাহা-দিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা মুসলমান ও খ্রীষ্টান বলিয়াই গণ্য হইল। এইরূপে "এক যাত্রায় পৃথক্ ফলের" ব্যবস্থা হওয়ায়, ওডোনেল বাহাদুরের সংকলিত আদম-সুমারীর তালিকায় মুসলমানের সংখ্যা মোটের উপর প্রতি দশ হাজারে ৪৯ জন হিসাবে বাড়িয়া গেল! ইহার পর ওডোনেল বাহাদুর গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই হারে বরাবর হিন্দুর সংখ্যা-

হ্রাস ও মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে ৬৫০ বৎসরে বঙ্গদেশ হিন্দু-শূন্য ও মুসলমানময় হইয়া উঠিবে, এবং পূর্ব্ববঙ্গে ৪ শত বৎসর পরে আর একজন হিন্দুও থাকিবে না! কর্ণেল মুখোপাধ্যায় স্বীয় পুস্তিকায় এ বিষয়ের আভাস দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "হিন্দুর অস্তিত্ব কত বৎসরে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা পর্য্যন্ত তিনি (মিঃ ওডোনেল) গণনা করিয়াছিলেন।" সাড়ে ছয় শত ও চারিশত বৎসরের কথাটা মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুলিয়া বলেন নাই কেন? সে যাহা হউক, মুসলমানের ঐরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি যে সর্ব্বাংশে তাহাদিগের বংশ-বিস্তার ক্ষমতার ফল নহে,—পূর্ব্ববারের গণনায় ভ্রান্তিহেতু ঐরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, একথা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর ওডোনেল বাহাদুর যাহাদিগকে এনিমিষ্ট-শ্রেণীভুক্ত করিয়া হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অনেকে এখন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দ্বিজত্বের দাবী করিতেছে!

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় যাঁহারা হিন্দুয়ানীর বিস্তার রুদ্ধ হইতেছে ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সান্ত্বনার জন্য এই প্রসঙ্গে আরও দুই জন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধৃত করা গেল :—

So far from Bramhanism being a non-missionary religion, one might safely aver that more persons in India become every year Brahminists than all the converts to all the other religions in India put together....The Bramhan civilises both the Gods and worshippers, and introduces them (the non-Aryans) into more refined society. Thus the casteless tribes, the non-Aryan aborigenes, soon find themselves formed into a caste and enter the fold of Hinduism. This is the way of the growth and constitution of Hindu society and Hinduism.—*Asiatic Studies* by Sir Alfred Lyall (First series. pp. 134 and 149.)

অর্থাৎ খ্রীষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর যত লোক দীক্ষিত হয়, তাহাদিগের মোট সংখ্যা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে প্রতিবৎসর অধিক লোক দীক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা নানাস্থানেই অনার্য্যদিগকে ও তাহাদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে সুসংস্কৃত করিয়া আপনাদিগের সভ্যতর সমাজে স্থান দিয়া থাকেন।

এক্ষণে স্যার আল্‌ফ্রেড লায়ালের সমগ্র ভারত-বিষয়িণী উক্তি ত্যাগ করিয়া খাস বাঙ্গালার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাহাদুর বিগত ১৮৭১ অব্দের বঙ্গীয় শাসন-বিবরণীর এক স্থলে লিখিয়াছেন,——

It is a mistake to suppose that the Hindu religion is not proselytising ; the system of castes gives ample room for the introduction of any number of outsiders. So long as people do not interfere with existing castes they may form a new caste and call themselves Hindus ; and *the Brahmins are always ready to recieve all who will submit to them and pay them.*

অর্থাৎ হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ প্রথা থাকায়, হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত যত লোকের ইচ্ছা হিন্দু-সমাজে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিলে যে কোন শ্রেণীর লোক একটি নূতন জাতি গঠন করিয়া হিন্দু নামে পরিচিত হইতে পারে ; তাহাদিগকে হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ইহা কি ধ্বংসোন্মুখ জাতির লক্ষণ ? কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আসামের অধিকাংশ অধিবাসীই শ্যামদেশীয় এবং বৌদ্ধ ও অনার্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। বিগত দুইশত বৎসরের মধ্যে তাহাদিগের তিন চতুর্থাংশের অধিক লোক হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু-সমাজের ছায়ায় আশ্রয়-লাভ করিয়াছে। বিগত ১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণেও রিজলী সাহেব লিখিয়াছেন,—

All over India at the present moment there is going on a process of the gradual and insensible transformation of aboriginal tribes into Hindu castes. —p. 519.

তবে ওডোনেল সাহেবের ন্যায় আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখকেরা দয়া করিয়া এই সকল নবদীক্ষিত জাতিকে হিন্দু বলিয়া গণ্য না করিলে লোক-গণনায় হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে ?

এক্ষণে, পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের আদমসুমারীতে যে সকল নবদীক্ষিত বন্যজাতি হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কতজন ওডোনেল বাহাদুরের কৃপায় হিন্দুসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া এনিমিষ্ট-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের গণনায় এনিমিষ্টদিগের সংখ্যার কিরূপ তারতম্য ঘটিয়াছিল।—

	১৮৮১ অঃ	১৮৯১ অঃ
পশ্চিমবঙ্গ	২,১৯,৬১৪	২,৮২,৬৭১
মধ্যবঙ্গ	৮৩৭	৯,৭২০
উত্তরবঙ্গ	৭,৪৬৮	৪১,৭৬৯
মানভূম	৬৫,৯৪৮	১,৬৬,০২৯
পূর্ব্ববঙ্গ	২৬,০৫০	৩৬,০৬০
মোট	৩,১৯,৯১৭	৫,৩৬,২৪৯

উদ্ধৃত তালিকায় মনোযোগ করিলে, পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ১৮৮১ অব্দ হইতে ১৮৯১ অব্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে, অর্থাৎ বর্দ্ধমান বিভাগে 'এনিমিষ্ট'দিগের সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৯জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যবঙ্গের বৃদ্ধির হার পাঠকের কল্পনা-শক্তিকে পরাস্ত করিবে। ঐ বিভাগে ৮৩৭ জনের স্থলে একেবারে ৯৫০ হাজার হইয়াছে; অর্থাৎ, সাড়ে দশগুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে এরূপ বংশ-বৃদ্ধি কি কোনও দেশে, কি কোনও জাতির মধ্যে সম্ভবপর? উত্তরবঙ্গে এনিমিষ্টের সংখ্যা প্রায় ৫॥০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে! মানভূমে ২॥০ গুণ বাড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৯ জন হইয়াছে। সিবিলিয়ান ওডোনেল বাহাদুরের গণনা-মাহাত্ম্যে এনিমিষ্টদিগের যেরূপ বংশবৃদ্ধি হইয়াছে, সে কালের রাক্ষসরাজ রাবণের বংশও সেরূপ খরবেগে কখনও বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না সন্দেহ!

১৮৯১ অব্দের আদমসুমারীতে নবদীক্ষিত হিন্দুদিগকে লইয়া অনেকস্থলে যেরূপ জোরজবরদস্তি হইয়াছিল, ১৯০১ অব্দে সেরূপ হয় নাই। এই কারণে দেখিতে পাই, ১৮৯১ অব্দে যে বর্দ্ধমান বিভাগে এনিমিষ্টের সংখ্যা শতকরা ২৯ জন হিসাবে বাড়িয়াছিল, ১৯০১ অব্দে তাহা শতকরা সার্দ্ধ দুইজনের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং তৃতীয় সুমারীতে তাহারা শতকরা ৩জনের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই, মনে করিলে সবিশেষ দোষ হয় না। এই অনুমান যদি নিতান্ত গর্হণীয় না হয়, তাহা হইলে বর্দ্ধমান বিভাগে এনিমিষ্টদিগের বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে ৬,৬০০ অপেক্ষা অধিক হয় নাই বলিতে হইবে। কিন্তু মিঃ ওডোনেলের অবলম্বিত অভিনব পদ্ধতির ফলে তাহাদিগের সংখ্যা ৬৩ হাজারেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে! এই সংখ্যা হইতে প্রকৃত বৃদ্ধির অঙ্ক ৬,৬০০ বাদ দিলে প্রায় ৫৬॥০ হাজার অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং মিঃ ওডোনেল এই ৫৬॥০ হাজার হিন্দুকে বল-পূর্ব্বক এনিমিষ্ট-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ আদম-সুমারীর মধ্যবর্ত্তী কালে "এনিমিষ্টদিগের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পূর্ব্ববারের হার তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ধরিয়া গণনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ১৮৯১ অব্দে মধ্যবঙ্গে অন্যূন ৮৫০

হাজার ও উত্তরবঙ্গে প্রায় ৩০ হাজার নিম্নশ্রেণীর নবদীক্ষিত হিন্দুকে এনিমিষ্ট দলে ফেলা হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ ও মানভূম জেলায় যথাক্রমে শতকরা ১০ ও ৮ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ধরিলে দেখা যাইবে যে, ওডোনেল সাহেব ঐ দুই প্রদেশের প্রায় একলক্ষ অনার্য্য বাঙ্গালী হিন্দুকে এনিমিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এই সকল অঙ্ক যোগ করিলে ১লক্ষ ৯৫ হাজার হয়। এতদ্ভিন্ন ১৮৮১ অব্দ হইতে ১৮৯১ অব্দের মধ্যে অবশ্যই বন্য জাতীয় বহু সহস্র লোক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া থাকিবে। তাহারাও ওডোনেল বাহাদুরের কৃপায় হিন্দুর সংখ্যায় স্থান-লাভ না করিয়া এনিমিষ্টদিগের দলপুষ্টি করিয়াছে। ইহাদিগের সংখ্যা ন্যূনকল্পে অর্দ্ধলক্ষ ধরিলেও বঙ্গীয় নবদীক্ষিত অনার্য্য হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ২॥০ লক্ষ হইবে। এই ২॥০ লক্ষ হিন্দু ১৮৯১ অব্দে এনিমিষ্ট-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল।

এখন ১৮৯১ অব্দের লোক-গণনার ফল কিরূপ হইয়াছিল, দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিঃ গেটের তালিকায় প্রকৃত খাস বাঙ্গালায় মানভূম ও শ্রীহট্ট-কাছাড় ভিন্ন অপর সকল অংশেরই অধিবাসীদিগের সংখ্যা পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব তাঁহার সংকলিত অঙ্কই এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

	হিন্দু	মুসলমান
মিঃ গেটের তালিকামতে	১,৮৯,৭৫,৯৭৮	২,০১,৭৪,৫৯৩
মানভূম	৯,৭২,৫০৯	৫৩,২৫৫
শ্রীহট্ট কাছাড়	১২,৫৬,০০২	১২,৩৬,৮৩০
ফরাসী চন্দননগর	৪,১৪৩	৬১৮
মোট—	২,১২,০৮,৬৩২	২,১৪,৬৫,২৯৬

মিঃ সি, জে, ওডোনেল বাহাদুর নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে সকল অনার্য্য বাঙ্গালী হিন্দুকে বল-পূর্ব্বক "এনিমিষ্ট"-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সংখ্যা পূর্ব্বোক্ত ২কোটী ১২লক্ষ হিন্দুর অঙ্কে যোগ দেওয়া বিধেয়। কারণ, প্রথমতঃ পরবর্ত্তী আদম-সুমারীর সময় ইহারা এনিমিষ্ট-শ্রেণীভুক্ত হইতে সবিশেষ আপত্তি করায় ইহাদিগের অনেকে পুনরায় বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের জন-গণনায়

ইহারা বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে ঐ দুই বারের আদম-সুমারীর যে গণনা-ফল উদ্ধৃত করিয়াছি এবং কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ও যে ফল উদ্ধৃত করিয়াছেন, বঙ্গের অনার্য্য হিন্দুর সংখ্যা তাহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কাজেই অন্য যুক্তির অভাব হইলেও, কেবল পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্যও, ইহাদিগের সংখ্যা আমরা বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যার সহিত যোগ করিতে বাধ্য। কিন্তু ইহারা যে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য, তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ইহারা একদিকে যেমন স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশে বাস করিতেছে ও বাঙ্গালীর চেষ্টায় হিন্দুত্ব লাভ করিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ ইহাদিগের অনেকে বাঙ্গালা ভাষাকেও আপনাদের মাতৃ-ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। ইহাদের সজাতীয়দিগের মধ্যে যাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা-বর্দ্ধনে সহায়তা করিতেছে। এই কারণে জন-শক্তির বিচার-প্রসঙ্গে আমি বাঙ্গালী অনার্য্য হিন্দুদিগকে বর্জ্জন করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না। অনার্য্য হিন্দু-দিগের সংখ্যা যোগ করিলে সামাজিক বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায় :—

হিন্দু	২,১৪,৫৮,৬৩২
মুসলমান	২,১৪,৬৫,২৯৬
	৪,২৯,২৩,৯২৮

এই জন সংখ্যার মধ্যে হিন্দী, উড়িয়া, উর্দ্দু প্রভৃতি ভিন্ন-ভাষা-ভাষী বিদেশীর সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ ৮ হাজার ছিল। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা সেবার অনেক অধিক ছিল। এই কারণে, মুসলমানের ভাগে ৬ লক্ষ ও হিন্দুর ভাগে ১৬৷৷০ লক্ষ ফেলিলে দৃষ্ট হইবে যে, আলোচ্য অব্দে সামাজিক বাঙ্গালায় প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

হিন্দু	১,৯৭,৭৬,৬৩২
মুসলমান	২,০৮,৬৫,২৯৬
মোট	৪,০৬,৪১,৯২৮

তদ্ভিন্ন—ভাগলপুর বিভাগে	৩,২৯,৯৫৮
ছোটনাগপুর বিভাগে	১,৬৬,০০০
পাটনা বিভাগে	৮,১৪০
উড়িষ্যা বিভাগে	৮৬,৯৬০
উত্তর ভারতে	২৫,৪৩৬
আসাম প্রদেশে	৪,৮০,৬২০
ব্রহ্মদেশে	১,৭৯,২৮১
অন্যান্য প্রদেশে	৬,৩৩৬
সমগ্র ভারতে	৪,১৯,২৪,৬৫৯

এই তালিকার সহিত ১৮৮১ অব্দের তালিকার তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে. পাটনা, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও উত্তর-ভারতাদি প্রদেশে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বংশ-বৃদ্ধির ফল নহে। বাঙ্গালী হিন্দু যে চাকুরী, তীর্থবাস প্রভৃতি কারণে দিন দিন অধিক সংখ্যায় বিদেশে গমন করিতেছে, এই অঙ্কগুলি তাহারই সুস্পষ্ট নিদর্শন। আসামে বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ-শাসনাধীন হওয়ায় বহু সংখ্যক হিন্দু বাঙ্গালী চাকুরী উপলক্ষে ঐ দেশে গমন করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ১৮৯১ অব্দের হিসাবে স্থূলতঃ আসামে অর্দ্ধেক ও ব্রহ্মদেশে এক তৃতীয়াংশ বাঙ্গালা-ভাষী হিন্দু ছিল বলিয়া ধরিলে, আমার বোধ হয়, কোনও দোষ হয় না। ভাগলপুরের পূর্ণিয়া জেলায় কয়েক সহস্র মুসলমান বঙ্গ ভাষায় কথা কয়। সাঁওতাল পরগণাতেও স্বল্পসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানের বাস। এই সকল কথার বিচার করিলে ১২ লক্ষ ৮২ হাজার প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ মুসলমান ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ১৮৯১ অব্দে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মোট সংখ্যা এই রূপ দাঁড়াইতেছে :—

(১৮৯১ অঃ)

হিন্দু	১,৯৭,৭৬,৬৩২	মুসলমান	২,০৮,৬৫,২৯৬
	+ ৮.৭৬,৭৮০		+ ৪.০৬,০০০
	২.০৬,৫৩,৪১২		২,১২,৭১,২৯৬
			—২০৬,৫৩,৪১২

৬,১৭,৮৮৪ মুসলমান অধিক।

সুতরাং ১৮৮১ অব্দ হইতে ১৮৯১ অব্দ পর্য্যন্ত দশবর্ষে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ এইরূপ :—

হিন্দু	৭,৩২,৪১২	বা শতকরা ৩.৬৭ জন
মুসলমান	১৭.৬৫,১৯৬	,, ৯.০৫ জন
মোট	২৪,৯৭,৬০৮	জন বাড়িয়াছে।

পূর্ব্বাপর তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, প্রথম বারের আদম-সুমারীর পর নয় বর্ষে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ১ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দশ বৎসরে উহার পরিমাণ ৭ লক্ষ ৩২৷৷০ সহস্রের অধিক হয় নাই। পক্ষান্তরে ঐ সময়ের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১৭৷৷০ লক্ষ বাড়িয়াছিল। কেন এরূপ হইল? কেন এই দশ বৎসরে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা এত অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল? পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিব।

(৮)

হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের কারণ।

(ভ্রান্ত মতের খণ্ডন)

১৮৮১ অব্দ হইতে ১৮৯১ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা নাম-মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভয়ঙ্কর বংশ-ক্ষয় ভিন্ন এরূপ ঘটনার আর কোনও কারণই হইতে পারে না। কেন বাঙ্গালী হিন্দুর এরূপ বংশক্ষয় হইল ? যে সময়ের মধ্যে মুসলমান বাড়িল, কিঞ্চিদধিক ১৭॥০ লক্ষ; সে সময়ের মধ্যে হিন্দুর বৃদ্ধি ৭।০ লক্ষের বড় অধিক হইল না কেন ? পূর্ব্ববর্ত্তী আদম-সুমারীর সময় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা প্রায় ৪।০ লক্ষ অধিক ছিল; তথাপি হিন্দু কমিল কেন ?

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের কারণাবলীকে প্রধানতঃ সামাজিক ও বৈষয়িক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (৬৯ পৃঃ) তাঁহার মতে ইংরাজ-আমলে বঙ্গের ভূম্যধিকারীদিগের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে "কুফলই প্রসূত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশের জমিদার বা সম্ভ্রান্ত লোকেই শিক্ষা, শিল্প-ব্যবসাদির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।......মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দু জমিদারের সংখ্যা অধিক ছিল। যেখানে একজন মুসলমান জমিদার বা তালুকদার ছিল, সেখানে দশজন হিন্দু জমিদার বা তালুকদার ছিল; সুতরাং যখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল, তখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরাই অধিকতর পর্য্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।" তাহার পর পাশ্চাত্য বাণিজ্য-সংঘর্ষের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"শিল্পি-শ্রেণীর মধ্যেও ঐরূপ ফল ফলিল। মুসলমান শিল্পী হিন্দুর ন্যায় সহ্য করিল বটে, কিন্তু হিন্দু শিল্পীর সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত ক্ষতির ভারটা হিন্দুর স্কন্ধেই গুরুতর রূপে আসিয়া পড়িল।" (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।)

সামাজিক বিষয়ে ইংরাজের আইনে হিন্দুর তেমন গুরুতর ক্ষতি হয় নাই বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং যে সামান্য ক্ষতি ঘটিয়াছে, তাহারও কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে হিন্দুর সামাজিক ব্যবহারের দোষেই হিন্দুর অপরিমেয় ক্ষতি ঘটিতেছে। এবং তাহাই

তাঁহার মতে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের প্রধান কারণ। এ বিষয়ে কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি এই :—

(ক) মুসলমানদিগের প্রাধান্য-লাভের মুখ্য কারণ, তাহাদিগের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন এবং মুসলমান সমাজের প্রত্যেক লোকের নীতি-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত। (পৃঃ ৮৯)

(খ) মোট কথা, হিন্দুদিগের মধ্যে, কি উচ্চ, কি নীচ, কোনও শ্রেণীতেই ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই। ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার কথাটাই আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হয় না। বস্তুতঃ অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মুসলমান, সে ধনীই হউক, আর নির্ধনই হউক, এক একটী মসজিদ-অন্তর্গত ধর্ম্মসমাজ-ভুক্ত। এই সকল মসজিদে যথানিয়মে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, এবং সে তাহা শিক্ষা করে। হিন্দুরা বেশীর ভাগ মাদকসেবী হয়। যেখানে একজন মুসলমানকে পানদোষে লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে একহাজার হিন্দুকে ঐ দোষে লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। (৬৭ পৃঃ)

(গ) মুসলমানেরা যেরূপ নীতি শিক্ষা করে, হিন্দুরা সেরূপ করে না। নৈতিক উন্নতির নিমিত্তই মুসলমানদিগের প্রাধান্য ঘটিতেছে এবং (তদভাবে) হিন্দুদিগের লয়প্রাপ্তি হইতেছে। (পৃঃ ৫৮)

(ঘ) যেখানে ১০০ হিন্দু গঞ্জিকাদি সেবন করে, সেখানে একজন মাত্র মুসলমান করে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই মাতাল হইয়া থাকে। হিন্দুরাই গাঁজা, চরস, চণ্ডু সেবন করে, সিদ্ধি খাইয়া থাকে। হিসাব করিলে ইহাদের প্রত্যেকের নেশায় ব্যয় কত হয়—প্রকাশ হইয়া পড়ে। যে জাতি মাদকতা-বিভাগে এত টাকা দিয়া থাকে, সে জাতির নৈতিক উন্নতি কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়। (৬৪ পৃঃ)

(ঙ) পাপের ফল মৃত্যু। আমরা—হিন্দুরা—গুরু পাপ করিয়াছি। ভগবানের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছি, কাজেই তাহার দণ্ডভোগ করিতেছি। স্বধর্ম্মী স্বজাতির প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের মূলেই আমাদিগের ধ্বংস-লাভের বীজ নিহিত আছে। ইহাই হিন্দুর ইতিহাস। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ইহারই ফল ফলিতেছে। (৯২পৃঃ)।

উল্লিখিত কথাগুলি "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুস্তিকার আর দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণের উল্লেখ আছে, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। "হিন্দু সমাজ"-নামধেয় যে নিবেদন-পত্রের বহু সহস্র খণ্ড মুখোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রিত করাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি এইরূপে পরিস্ফুট করা হইয়াছে :—

(ক) "যে ব্যাধি হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নাম "ক্ষয়রোগ"। চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্ষয়রোগ—যক্ষ্মা অপেক্ষা ভীষণরোগ আর নাই। ......ক্ষয়রোগের প্রধান ও বোধ হয় একমাত্র কারণ, দেহের পরিপুষ্টির অভাব। আমাদের সমাজদেহে যে ক্ষয়রোগ জন্মিয়াছে, তাহারও প্রধান কারণ পরিপুষ্টির অভাব। মূলকথা অর্থাভাব। ... আমরা বাস্তবিকই খাইতে পাই না।

(খ) ১০০ জন হিন্দুর মধ্যে ১০ জন ভদ্রনামে আখ্যাত, ২৯ জন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত বাকী ৫৮ জন নীচ বলিয়া স্বীকৃত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ?

ব্রাহ্মণ বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া ঘৃণা করে, বৈদ্য কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করে, কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতিকে ব্যবসায়জীবী বলিয়া ঘৃণা করে, নবশাখেরা গোয়ালা কৈবর্ত্তদিগকে ঘৃণা করে, ইহারা আবার সূত্রধর প্রভৃতিকে ঘৃণা করে, সূত্রধর প্রভৃতিও নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিকে ঘৃণা করে, নমঃশূদ্র আবার মুচি কাওরাদের ঘৃণা করে। হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ৫৮ জনের জল অস্পৃশ্য। লোকে গরুর গাড়ী করিয়া দূর হইতে গঙ্গাজল লইয়া যায়, পথে কতরূপ আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকে, কতরূপ ময়লা থাকে, তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যায়; তথাপি সে জল সেবনীয়; কিন্তু বাড়ি পৌছিলে একজন নীচ জাতি যদি সেই কলসী স্পর্শ করে তবে সে জল ফেলিয়া দিতে হয়। অনেকে, আহারের সময়ে যদি নিকটে একটা আস্তাকুড়ের বিড়াল থাকে, তবে নিজপাত হইতে তাহাকে অন্ন তুলিয়া দেয়; কিন্তু সেই ঘরে যদি একজন স্বধর্ম্মী "নীচ" জাতি বাঙ্গালী প্রবেশ করে, তাহা হইলে নিজেকে অপবিত্র মনে করেন। এই "নীচ জাতি" হিন্দুসমাজে ১০ জন বাঙ্গালীর মধ্যে ৬ জন। যে সমাজ প্রধানতঃ এইরূপ নির্জ্জীব, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত উপাদানে গঠিত, সে সমাজে যে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

(গ) ইসলাম ধর্ম্মে জাতি নাই ও জাতিগত প্রভেদ নাই। উচ্চ, নিম্ন, অধম বলিয়া কোনরূপ বৈষম্য নাই। সকলেই পরস্পরের সমকক্ষ, কেহ কাহাকেও দেবতা বলিয়া মানে না, অথচ কাহাকেও অস্পৃশ্য, অধম বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে না। দিনে দিনে মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছে। এই একতাবদ্ধ মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহিত পরস্পর-বিদ্বেষী হিন্দুজাতির সংঘর্ষের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহারই ফলে হিন্দুসমাজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া লোপ পাইবার পথে দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুসমাজ ধর্ম্মোপদেশ ভুলিয়াছে, স্বধর্ম্মীদিগের উপর বিদ্বেষ এখন একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বাঙ্গালী হিন্দুর দারিদ্র্য ও জাতিগত প্রভেদই তাহাদিগের বংশলোপের প্রধান কারণ। দারিদ্র্যের মনুষ্যনাশ-শক্তি-সম্বন্ধে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইতঃপূর্ব্বে ৪র্থ ও ৫ম পৃষ্ঠায় জনসংখ্যার যে তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও দৃষ্ট হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বংশবৃদ্ধির হার অধিক। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গে ঘনঘন দুর্ভিক্ষপাত হয় না। কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে, আমার বোধ হয়, মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ, জাতি-গত প্রভেদ এদেশে নূতন নহে। বিশেষতঃ ১৮৭২ অব্দ হইতে ১৮৯১ অব্দের মধ্যে যে ঐ প্রভেদ অতীব প্রবল হইয়াছিল, একথার প্রমাণাভাব। আবার শেষ আদম-সুমারীর সময় দেখিতে পাই, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা পূর্ব্ববারের

প্রায় দ্বিগুণ বা ১৩ লক্ষ ৭৮ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শেষোক্ত দশ বৎসরে দারিদ্র্য-সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; জাতিগত প্রভেদের মাত্রাও কিছু কমিয়াছিল, বলিয়া মনে হয় না। ফল কথা, জাতিগত প্রভেদের অন্য যতই কুফল থাকুক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আদম-সুমারীতে হিন্দুর জনসংখ্যা-হ্রাস-বিষয়ে উহার কোনও কার্য্যকারিতা ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন করা বোধ হয় কাহারও পক্ষে সহজ-সাধ্য হইবে না।

তবে ঐ আদমসুমারীতে হিন্দুর সংখ্যা এত কমিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখক মহাশয় ও প্রত্যক্ষদর্শী অন্যান্য রাজপুরুষেরা যেরূপ দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন, সে উত্তর সন্তোষ-জনক কি না?

১৯০১ অব্দের ভারতীয় আদম-সুমারীর বিবরণ রচনা-প্রসঙ্গে মিঃ রিজলী বলেন, বর্দ্ধমানের মহামারীর জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুগণের উৎপাদনী-শক্তি বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। কথাটা ১৮৯১ অব্দের বিবরণীতে প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বর্দ্ধমান বিভাগের কথাই ধরা যাউক। দ্বিতীয়বারের আদম-সুমারীর পর বর্দ্ধমান সহরে নির্ম্মল পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কার্য্য বিস্তার-লাভ করায় ও আসনসোলে নূতন রেললাইন নির্ম্মিত হইতেছিল বলিয়া দূর দেশ হইতে ঐ দুই অঞ্চলে বহু কুলির আমদানি হইয়াছিল। এই কারণে উক্ত তিনটি স্থানে জন-সংখ্যা শতকরা ৯ হইতে ২৮ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই তিনটি স্থান বাদ দিয়া গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বর্দ্ধমান জেলায়, তৃতীয় আদম-সুমারীর পূর্ব্ববর্ত্তী দশবৎসরে, কোনও স্থানে শতকরা ৩॥৹ জনেরও অধিক ও কোনও স্থানে শতকরা প্রায় ৫ জন পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ওল্ডহ্যাম সাহেব লিখিয়াছেন,—

The decrease is attributed to the malaria which on the district was most violent in the years 1881 to 1887. The ruined houses and abondoned sites were everywhere visible. The peoples physique was poor and feverstricken and throughout the district they presents the same appearance. In fact the sick physique is the ordinary physique.—p. 92.

ম্যাজিষ্ট্রেট ওল্‌ডহ্যাম সাহেবের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, যে মহামারীতে ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর জীবনান্ত ঘটিতেছিল, সেই ভীষণ মহামারীর অবসানের পরে বর্দ্ধমান জেলায় ম্যালেরিয়া স্থায়িত্বলাভ করে। সেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তত্রত্য এত লোক প্রাণত্যাগ করে যে, ঐ প্রদেশের জন-সংখ্যা মোটের উপর শতকরা চারিজন হিসাবে কমিয়া যায়, এবং যাহারা জীবিত ছিল, তাহারাও অস্থিসার দেহে অতীব শোচনীয় অবস্থায় দিনযাপন করিতেছিল। মিঃ সি, জে, ওডোনেল লিখিয়াছেন—

There is no doubt but that the people exhausted by desease, are physically unfit to reproduce themselves—p. 93.

অর্থাৎ দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া জনসাধারণ এরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদিগের অপত্যোৎপাদনের সামর্থ্য ছিল না।

বীরভূমের দক্ষিণ অংশে দ্বিতীয় আদম-সুমারীর পর ম্যালেরিয়া ভীষণমূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। তৎসম্বন্ধে ওডোনেল সাহেব বঙ্গীয় "স্যানিটারি কমিশনার" মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

The sickness was unprecedentedly great and the mortality heaviest ever known. —p.98.

এই ম্যালেরিয়ায় বীরভূমের কোনও কোনও স্থানে হাজারে ৩১॥০ হইতে ৪৮॥০ জন পর্য্যন্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল! তদ্ভিন্ন জেলার প্রায় সকল অংশেরই লোককে অল্পাধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে হইয়াছিল। স্যানিটারি কমিশনারের রিপোর্টসমূহ হইতে এইরূপে প্রত্যেক জেলার সম্বন্ধে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে গেলে, গ্রন্থের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলিয়া আদম-সুমারীর অধ্যক্ষ ওডোনেল সাহেব সে সকলের সারসংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে লিখিয়াছেন,—

There has been an increase of only 0. 5 p. c. a result due to the persistant and verulent fever, which takes its name from the Burdwan district, and partly to heavy floods in recent years in the districts of Nadia and western Jessore.—p. 49.

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ও কয়েক বৎসরের ভয়ঙ্কর বন্যায় নদীয়া ও পশ্চিম যশোহরের জন-সংখ্যার বহুল হ্রাস হইয়াছে। তাই বিগত দশ বৎসরে ঐ সকল প্রদেশে গড়ে শতকরা অর্দ্ধজনের অধিক লোক-

সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ফল কথা, হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে আধিদৈবিক বিপদ প্রায় পূর্ব্ববৎ স্থায়ী হওয়ায় ১৮৯১ অব্দেও হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ অতি অল্প হইয়াছিল—অন্ততঃ রাজপুরুষদিগের রচনা পাঠ করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। তৃতীয় বারের আদম-সুমারীর পর পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্বোক্ত আধিদৈবিক বিপদ বহু পরিমাণে লোপ পায়; কাজেই সেবার হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রায় শত-পৃষ্ঠ-ব্যাপী পুস্তিকার কুত্রাপি এই আধিদৈবিক বিপদের কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাই তাঁহার পুস্তিকা পাঠ করিয়া অনেকেরই ধারণা জন্মিয়াছে যে, সামাজিক ব্যবস্থার দোষে, বিশেষতঃ জাতিগত প্রভেদের জন্যই বাঙ্গালী হিন্দু ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। তিনিও প্রধানতঃ এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "স্বধর্ম্মীদিগের উপর বিদ্বেষ এখন (হিন্দুর) একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই ফলে (হিন্দু-সমাজ) লোপ পাইতে বসিয়াছে।" অপিচ তিনি মনে করেন, "আমরা—হিন্দুরা—গুরুপাপ করিয়াছি, কাজেই তাহার দণ্ডভোগ করিতেছি।" কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মহামারীর আবির্ভাব কোন্ পাপের ফল, কোন্ গুরুতর সামাজিক পাপে ঐ মহামারীতে পশ্চিমবঙ্গের বিংশত্যধিক লক্ষ লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, তাহা কর্ণেল মহোদয় জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

আদম-সুমারীর বিবরণে ম্যালেরিয়া-জনিত মৃত্যুর সংখ্যাধিক্যকেই হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বঙ্গের "স্যানিটারি কমিশনার" মহোদয়ের প্রকাশিত রিপোর্টে নিবদ্ধ ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের দ্বারা লিপিবদ্ধ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লব্ধ তথ্যসমূহের দ্বারা সেই মত সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং সেই মতে উপেক্ষা প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। অবশ্য ম্যালেরিয়ার কারণ-সম্বন্ধে বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিবার সম্ভাবনা। সে মতভেদের মীমাংসায় যত্ন-প্রকাশ বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় অব্যবসায়ীর পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা-মাত্র। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইলে

হিন্দু-মুসলমান সমভাবেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, দেখিতে পাই। মুসলমানের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কি না, সে তত্ত্বও কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় বিজ্ঞ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরই আলোচ্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। সুতরাং সে বিষয়ে কোনও মনীষী আলোচনা-পূর্ব্বক স্বজাতি-বিদ্বেষ বা কোনও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার সহিত ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপাদন না করা পর্য্যন্ত, আমরা রাজপুরুষদিগের প্রচারিত মতই এ বিষয়ে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস-সম্বন্ধে তাঁহারা যে কয়েকটি গৌণ কারণের উল্লেখ করিয়া থাকেন, স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করিব। এখন বঙ্গের চতুর্থ বারের লোক-গণনার ফল লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছি।

---

(৯)

১৯০১ অব্দের জন-গণনার ফল।

(হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি।)

বঙ্গে চতুর্থবার লোক-গণনা-কার্য্য ১৯০১ অব্দের প্রারম্ভে সম্পাদিত হয়। সেই গণনার ফল এইবার আমাদের আলোচ্য। পূর্ব্বপদ্ধতিক্রমে প্রথমে সামাজিক বাঙ্গালার মোট হিন্দু-মুসলমান-সংখ্যা সংকলিত হইতেছে।—

মিঃ গেটের মতে	হিন্দু।	মুসলমান।
খাস বাঙ্গালায়	২,০১,৯১,০৮২	২,১৯,৫৪,৯৭৭
মানভূমে	১১,৩২,৬১৯	৬২,৭৯৯
শ্রীহট্ট-কাছাড়ে	১৩,২৮,২১২	১৩,০৭,০২২
চন্দননগরে	৮,৪৯৭	২,১৮২
	২,২৬,৬০,৪১০	২,৩৭,২৬,৯৮০

উল্লিখিত হিন্দু-সংখ্যার মধ্যে যে সকলেই বাঙ্গালী নামের যোগ্য নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সিকিম নামক প্রদেশটি সরকারি হিসাবে খাস-বাঙ্গালার মধ্যগত হইলেও সামাজিক বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। সেখানকার ৩৮ হাজার ৩০৬ জন হিন্দুর মধ্যে একজনের অধিক বাঙ্গালী নাই। তাহার পর সামাজিক বাঙ্গালায় ৩ লক্ষ ৫২।০ হাজার উড়িয়া, ৫৮ হাজার নেপালী, ২২০০ মারওয়াড়ী, ৩ হাজার গুজরাথী, ১।০ হাজার আসামী ও ১৩০৫ জন মারাঠী প্রভৃতি আর্য্য-ভাষাভাষী হিন্দুর বাস। তামিল ও তেলেগু ভাষা-ভাষী ৭,৫৫২ জনের মধ্যে অধিকাংশই বা ৬ হাজার জনকে হিন্দু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই মোট ৪ লক্ষ ৮২ হাজার বৈদেশিক হিন্দুর সংখ্যা, বঙ্গদেশস্থ হিন্দুর পূর্ব্বোদ্ধৃত সংখ্যা হইতে বর্জ্জন করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন বিহার, পঞ্জাব ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দী, উর্দ্দু, পঞ্জাবী, পারস্য প্রভৃতি ভাষা-ভাষী ১৮ লক্ষ ৫১ হাজার জন সামাজিক বাঙ্গালায় স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বাস করেন। তন্মধ্যে প্রায় ৬।।০ লক্ষ মুসলমান ও ১২ লক্ষ হিন্দুকে বৈদেশিক বলিয়া বর্জ্জন করিলে সামাজিক বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত এইরূপ দাঁড়ায় :—

হিন্দু	২,২৬,৬০,৪১০	মুসলমান	২,৩৩,২৬,৯৮০
	—৪,৮২,০০০		—৬,৫১,০০০
	—১২,০০,০০০		২,২৬,৭৫,৯৮০
	২,০৯,৭৮,৪১০		

এই বার এনিমিষ্টদিগের কথা। সামাজিক বাঙ্গালার বন্য জাতিসমূহের মধ্যে ওডোনেল সাহেবের অনুগ্রহে যাহারা হিন্দুসমাজ হইতে অপসারিত হইয়া এনিমিষ্ট শ্রেণীতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীর সময় আপত্তি করিয়া পুনরায় হিন্দুশ্রেণীতে নাম লিখাইয়াছিল বলিয়া মিঃ গেট উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই কি আপত্তি করিয়াছিল? সরল-হৃদয় আরণ্যচরদিগের মধ্যে অনেকে হয় ত মিঃ ওডোনেলের চেষ্টায় সংবাদও রাখিত না এবং সেই জন্য কোনও আপত্তিও করে নাই, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। ১৯০১ অব্দের এনিমিষ্টদিগের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির তালিকায় মনোযোগ করিলে

এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। পূর্ব্ব আদম-সুমারীতে ও'ডোনেল সাহেব যে সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে এনিমিষ্টদিগের দলে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের ন্যূনাধিক এক চতুর্থাংশ লোক অজ্ঞতা-বশতঃ আপত্তি করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দু-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া লিখাইবার চেষ্টা করে নাই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহাদিগের সংখ্যা যোগ করিলে সামাজিক বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত এইরূপ দাঁড়ায় :—

হিন্দু	২,১০,৪১,০০০	
মুসলমান	২,২৬,৫৫,৯৮০	
মোট	৪,৩৭,৯৬,৯৮০	বাঙ্গালী।
ভাগলপুর বিভাগে	৩,৪১,৬০২	
ছোটনাগপুর বিভাগে	১,৬০,৪০১	
পাটনা বিভাগে	৭,১৪১	
উড়িষ্যা বিভাগে	১,০৭,৬৪০	
উত্তর ভারতে	২৬,৭৫৬	
আসামে	৬,২৪,৫৬৩	
ব্রহ্মদেশে	২,০৮,০৭৮	
অন্যান্য প্রদেশে	৭,০২৮	
সমগ্র ভারতে মোট	৪,৫২,০০,১৮৯ জন বাঙ্গালী	

এই তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে যে, শেষ বারের আদম-সুমারীর সময় সামাজিক বাঙ্গালার বাহিরে প্রায় ১৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ২১০ জন বাঙ্গালী নানা উপলক্ষে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছিল। এক্ষণে পূর্ব্বপ্রদর্শিত পদ্ধতি-ক্রমে বিভাগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, কিঞ্চিদধিক ৯ লক্ষ ৯০ হাজার বাঙ্গালী হিন্দু ও ৫ লক্ষ ৩ হাজার বাঙ্গালী মুসলমান সামাজিক বঙ্গের বহিঃপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহা হইলেই বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের মোট সংখ্যা এইরূপ ছিল, বলিতে হয় :—

১৯০১ অব্দের জন-গণনার ফল।

হিন্দু	মুসলমান
২,১০,৪১,০০০	২,২৬,৭৫,৯৮০
+ ৯,৯০,২০৯	+ ৫,০৩,০০০
২,২০,৩১,২০৯	২,৩১,৭৮,৯৮০
	—২,২০,৩১,২০৯
	১১,৪৭,৭৭১ মুসলমান অধিক।

তৃতীয় বারের আদম-সুমারীর পর দশ বৎসরে প্রকৃত বাঙ্গালীর মোট বৃদ্ধি ৩২ লক্ষ ৮৫ হাজার, ৪৯১ হইয়াছে। তন্মধ্যে—

হিন্দু	১৩,৭৭,৭৯৭	জন
মুসলমান	১৯,০৭,৬৯৪	জন
মোট	৩২,৮৫,৪৯১	জন বাড়িয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ববারের তুলনায় এবার হিন্দুর বৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। পূর্ব্ববারে হিন্দুর বৃদ্ধি কিঞ্চিদধিক ৭।০ লক্ষ হইয়াছিল, এবার ১৩৸০ লক্ষেরও অধিক হইয়াছে। পূর্ব্ববারে মুসলমানের বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিঞ্চিদধিক ১৭৷৷০ লক্ষ, এবার হইয়াছে, কিঞ্চিদধিক ১৯ লক্ষ-মাত্র। পূর্ব্ববারে হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির অঙ্কের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ৩৩ হাজারের পার্থক্য ছিল, এবারে সে পার্থক্য কমিয়া প্রায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ভীষণ আধিদৈবিক দুর্ঘটনার আবর্ত্তে বিজড়িত হইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে হিন্দু বংশ-বৃদ্ধি-বিষয়ে ক্রমশঃ মুসলমানের পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছিল, ঐ বিপদ অপগত হইবামাত্র হিন্দু জীবন-সংগ্রামের পথে সবেগে অগ্রসর হইয়াছে। শেষ বারের আদম-সুমারীতে হিন্দুর যে সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা হিন্দু-সমাজের জীবন-শক্তির পরিচায়ক অথবা ধ্বংস পথে অগ্রসর হইবার লক্ষণ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

(১০)
প্রকৃত কথা।

এখন একবার আমূল সকল কথার চিন্তা করিয়া প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা যাউক। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধির বিচারই যখন আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন সামাজিক বাঙ্গালী বাঙ্গালা-সমাজ বলিতে যাহা বুঝেন, তাহার লোক-সংখ্যা লইয়া আলোচনা করাই বিধেয়। এই কারণে, আমি প্রথমেই সরকারি "বেঙ্গল প্রপার" ও "সামাজিক বঙ্গের" প্রভেদ-নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া; নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ২৪ পরগণা, খুলনা; ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা—এই কয়টি জেলা লইয়া সামাজিক বঙ্গ। এই পুস্তিকার দশম পৃষ্ঠায় সামাজিক বঙ্গের জন-সংখ্যা তালিকার আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় সরকারি "বেঙ্গল প্রপার"কেই সামাজিক বঙ্গ মনে করিয়া যে গণনা-ফল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও পাঠকের তুলনার স্থবিধার জন্য সেই স্থলেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে পাঠক গণনা-ফলের কিরূপ তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইবেন। সরকারি বেঙ্গল প্রপারের সীমা সময়ে সময়ে যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহারও প্রতি মনোযোগ করেন নাই। এই দুই কারণে, তাঁহার সঙ্কলিত সংখ্যাগুলি তুলনা-ক্ষেত্রে নিতান্তই ভ্রমোৎপাদক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, সামাজিক বাঙ্গালীর নিকট সামাজিক বঙ্গের সীমা-পরিবর্ত্তন সহজ-সাধ্য ঘটনা নহে; রাজপুরুষদিগের লেখনীর আঘাতে সামাজিক বঙ্গের বিচ্ছেদ বা কোনও প্রদেশের সহিত বাঙ্গালীর সামাজিক সম্বন্ধের বিলোপ ঘটিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, এদেশের ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থসমূহে সামাজিক বঙ্গের কোনও পরিচয়ই পরিদৃষ্ট হয় না। ঐ সকল গ্রন্থে বঙ্গদেশের কেবল প্রাকৃতিক ও রাজনীতি বিভাগেরই সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। বঙ্গের সামাজিক বিভাগ বা সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ

করা যাইতে পারে, এমন কোনও গ্রন্থই ছাত্রদিগের পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত করা হয় নাই। এই কারণে দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক স্থলেই সমাজ-প্রীতি ও সমাজ-তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

সামাজিক বঙ্গের লোক-গণনা-ফলের প্রতি মনোযোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রথম আদম-সুমারীর সময়ে, সামাজিক বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা ৮।০ লক্ষ অধিক ছিল। দ্বিতীয় গণনার সময় ঈষদধিক ৫।।০ লক্ষ হিন্দু অধিক ছিল। তৃতীয় বারে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান হইয়া যায়। যে কারণে এইরূপ ঘটে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ মহামারীর প্রকোপে প্রায় বিংশতি লক্ষ লোক না মরিলে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া ও তজ্জনিত প্লীহা-যকৃতাদি রোগে বাঙ্গালী হিন্দু মুমূর্ষু দশায় কালযাপন করিতে বাধ্য না হইলে হিন্দুর সংখ্যা এরূপ হ্রাস পাইত না—বংশ-বৃদ্ধি-বিষয়ে মুসলমানের পশ্চাতে কখনই পড়িয়া যাইত না। চতুর্থ বারের জন-গণনায় মুসলমানের জন-সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা প্রায় ৬ লক্ষ অধিক হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান-সংখ্যার অতি বৃদ্ধির জন্যই মুসলমানদিগের এইরূপ সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে, ইহা গেট সাহেবের সঙ্কলিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধি হইবে। সে যাহা হউক, শেষ আদম-সুমারীতে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা ২৬ লক্ষ অধিক হইয়াছে বলিয়া যে কর্ণেল মুখোপাধ্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। সামাজিক বঙ্গে উভয়-সম্প্রদায়ের জন-সংখ্যার প্রকৃত পার্থক্য কিঞ্চিন্ন্যূন ৬ লক্ষ।

কিন্তু সামাজিক বঙ্গের সীমার মধ্যে যে সকল হিন্দু-মুসলমান বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে সকলেই প্রকৃত "বাঙ্গালী" নহে। প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা জানিতে হইলে মোট হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা হইতে হিন্দী, উর্দ্দু, মারওয়াড়ী প্রভৃতি ভাষা-ভাষী বিদেশীয়দিগের সংখ্যা বাদ দিতে হয়। এই কারণে, আদম-সুমারীর তালিকা-গ্রন্থের ভাষা-বিষয়ক তালিকা হইতে ভিন্ন-ভাষা-ভাষী বিদেশীয়দিগের সংখ্যা সঙ্কলন করিয়া আমি বঙ্গদেশস্থ হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা

হইতে বাদ দিয়াছি। এই কার্য্য শ্রমসাধ্য বলিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম তিন বারের আদম-সুমারীর ফল-নির্দ্দেশ-কালে বঙ্গদেশস্থ হিন্দু ও মুসলমান-মাত্রকেই বাঙ্গালী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কেবল চতুর্থ বারের জন-গণনার ফল-জ্ঞাপন-কালে তিনি এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা-নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতি যে ভ্রমশূন্য নহে, তাহা চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষাংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। সামাজিক বঙ্গের বহির্দ্দেশে বাঙ্গালীর যে সকল বংশধর জীবিকার্জ্জন বা ধর্ম্ম সঞ্চয়-উপলক্ষে বাস করিতেছে, তাহাদিগের কথা মুখোপাধ্যায় মহাশয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা যে নিতান্ত কম নহে, তাহা সেই প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সকল ত্রুটির যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত সংখ্যা, পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম পরিচ্ছেদে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এস্থলে, সাধারণের সহজে বুঝিবার সুবিধার জন্য আমাদের আলোচনা-লব্ধ ফল তালিকার আকারে প্রকাশ করা গেল।—

বাঙ্গালীর বংশ-বিস্তার।

অব্দ।	হিন্দুর সংখ্যা।	মুসলমানের সংখ্যা।	মন্তব্য।
১৮৭২	১,৯২,২২,০০০	১,৮৫,৪৬,৮০০	প্রায় ৬৸০ হাজার হিন্দু অধিক।
১৮৮১	১,৯৯,২১,০০০	১,৯৫,০৬,১০০	৪ লক্ষ ১৫ হাজার হিন্দু অধিক।
১৮৯১	২,০৬,৫৩,৪১২	২,১২,৭১,২৯৬	৬ লক্ষ ১৭৸০ হাজার মুসলমান অধিক।
১৯০১	২,২০,৩১,২০৯	২,৩১,৭৮,৯৮০	১১ লক্ষ ৪৭।০ হাজার মুসলমান।"

	বৃদ্ধির পরিমাণ।		বৃদ্ধির হার শতকরা	
	হিন্দু।	মুসলমান।	হিন্দু।	মুসলমান।
১৮৮১ অব্দে	৭,০১,০০০ জন।	৯,৫৯,৯৬৫ জন।	৩·৬৫	৫·১৮
১৮৯১ "	৭,৩২,২১২ "	১৭,৬৫,১৮৭ "	৩.৬৭	৯·০৫
১৯০১ "	১৩,৭৭,৭৯৭ "	১৯,০৭,৬৯৪ "	৬·৬৭	৮·৯৬
মোট—	২৮,১১,০০৯ "	৪৬,৩২,৮৪৬ "	১৪·৬২	২৪·৯৭

এই তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, ১৮৭২ অব্দে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা বাঙ্গালী সলমানের অপেক্ষা ৬৫০ লক্ষ অধিক ছিল। নয় বৎসর পরে সেই আধিক্যের রিমাণ কমিয়া কিঞ্চিন্ন্যূন ৪।০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ১৮৯১ অব্দে মুসলমানের ংখ্যা ৬ লক্ষাধিক বাড়িয়াছে, দেখা যায়। পরবর্ত্তী দশ বৎসরে মুসলমানের দ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বা কিঞ্চিন্ন্যূন ১১॥০ লক্ষ হইয়াছে। কর্ণেল খোপাধ্যায়ের গণনা-পদ্ধতির ভ্রান্তির জন্য মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ হিন্দুর অপেক্ষা ৬ লক্ষ অধিকরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সরকারি খাস বাঙ্গালার জন-সংখ্যার যে সাব গেট সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ১৯০১ অব্দে হিন্দু-মুসলমানের ধ্যে ১৭ লক্ষ ৬৪ হাজারের অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বাধ হয়, এত অল্প পার্থক্যের পক্ষপাতী নহেন। তাই অভিনব পদ্ধতির বলম্বন-পূর্ব্বক তিনি ২৬ লক্ষের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত- ক্ষে শেষবারের লোক-গণনায় মুসলমানের আধিক্য ১১ লক্ষ ৪৭।০ হাজারের পেক্ষা অধিক ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। আদম- মারীর তালিকা-গ্রন্থে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৭৮ লক্ষ ৬৩ জার ৪১১ বলিয়া লিখিত আছে, সেখানে মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় স্তিকায় ১ কোটী ৭৯ লক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যেখানে ২ কোটী ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৭৭ আছে, সেখানে ২ কোটী ২০ লক্ষ ধরিয়াছেন। কিন্তু ন্দুর সংখ্যা যেখানে সরকারি তালিকায় ১ কোটী ৮০ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৫৫ ছে, সেখানে তিনি উহা ১ কোটী ৮০ লক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লমানের বেলায় কিঞ্চিন্ন্যূন ৫৫ হাজারেই লক্ষ পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুর লায় ৬৮॥০ হাজারেও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লক্ষ পূর্ণ হয় নাই; ইহার রণ কি? মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য, পরমায়ু প্রভৃতি নানা ষয়ের নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গেইকর্ণেল মুখোপাধ্যায় এইরূপ বিস্ময়কর হিন্দু-হিতৈষণা ও দর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছেন! একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সে কল বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা করিব।

হিন্দুর সংখ্যা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের লোক-গণনায় কেন কমিয়াছিল ও চতুর্থ বারেই বা কেন বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল, তাহার আলোচনা পূর্ব্বেই বিস্তারিতরূপে করিয়াছি। হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের সহিত যে সামাজিক বা নৈতিক কোনও প্রকার কারণের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, সম্পূর্ণ আধিদৈবিক কারণেই যে, হিন্দু নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও বিশিষ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে মুসলমানের বৃদ্ধি কেন, ও কিরূপ হারে হইতেছে, তাহা দেখিবার চেষ্টা করা যাউক।

পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকায় নেত্রপাত করিলে জানা যায় যে, প্রথম বারের আদম-সুমারীর পরবর্ত্তী নয় বৎসরে মুসলমানের বৃদ্ধি ৯ লক্ষ ৬০ হাজার বা শতকরা ৫'১৮ জন হারে হইয়াছিল, পরবর্ত্তী লোক-গণনায় বৃদ্ধির হার ৯'০৫ হয়, আবার শেষ আদম-সুমারীর সময় কিঞ্চিৎ কমিয়া শতকরা কিঞ্চিন্ন্যূন ৯জনে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীতে মুসলমানের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। সামাজিক বা নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু যে এইরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ব-বঙ্গে আধিদৈবিক বিপত্তির সঞ্চার হওয়ায় মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির পথে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে যে ভীষণ ঝটিকা ও বন্যা হয়, তাহাতে ঐ প্রদেশের অন্তর্গত বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলায় বহু লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৮৭৮।৯ অব্দে ব্রহ্মপুত্র নদের জলোচ্ছ্বাসে রঙ্গপুর জেলার পূর্ব্বোত্তর অংশের বহুল ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরে অনেক লোকের বিনাশ ঘটিয়াছিল। এই সকল আধিদৈবিক বিপদে মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। তথাপি যে পূর্ব্ববঙ্গের বৃদ্ধির হার পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় অধিক হইয়াছে, তাহার কারণ বন্যা-ঝটিকাদির ন্যায় বিপদের ক্ষণস্থায়িতা ও স্বল্পব্যাপ্তি। হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে মহামারী ও ম্যালেরিয়া যেরূপ সুদূর ব্যাপ্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের বিপদাবলী সেরূপ হয় নাই—হইবার সম্ভাবনাও অল্প ছিল।

এই প্রসঙ্গে মুসলমানের বৃদ্ধির আর একটি কারণ সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রকৃতির আনুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকতর উর্ব্বর ও স্বাস্থ্যকর। গেট সাহেব বলেন,—

The only districts which are considered free from all danger of famine are the 24 Perganas, Darjiling and the districts of Eastern Bengal. In all other parts of the Province large areas are more or less liable to this calamity.

কৃষি-প্রধান দেশে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ-পাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল থাকে। পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির জন্য কৃষির ক্ষতি প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ একপ্রকার অশ্রুত-পূর্ব্ব ব্যাপার—অন্ততঃ আমরা যে সময়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি, সেই ১৮৮১ অব্দ হইতে ১৯০১ অব্দের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই। কাজেই অন্নগত-প্রাণ মনুষ্যের সংখ্যা যে পূর্ব্ব-বঙ্গেই অধিক বাড়িবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। পূর্ব্ববঙ্গের স্বাস্থ্যকরতা বঙ্গের অপর সকল অংশ অপেক্ষাই অধিক। পাটের চাষে পূর্ব্ববঙ্গবাসী প্রচুর ধনসঞ্চয়ে সমর্থ। ঢাকার বস্ত্র-শিল্পের বিলোপ ঘটায় ঐ প্রদেশবাসীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, পাটের ব্যবসায়ে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পরিপূরিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে, নদীয়ার বস্ত্র-শিল্প ও মুরশিদাবাদের রেশম ব্যবসায়ের স্থান আর কোনও লাভজনক ব্যবসায়ের দ্বারা অধিকৃত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য-বশতঃ, এই সুবিধার ফলভোগ তাহারাই অধিক পরিমাণে করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের বংশ-বৃদ্ধির হার যেরূপ, উত্তর বা পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ নহে, তাহা ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গেট সাহেবের তালিকায় দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেই বুঝা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে, হিন্দুর সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাহাদিগের বৃদ্ধির হার, ভূমির উর্ব্বরতা ও জল-বায়ুর স্বাস্থ্যকরতার জন্য, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক।

১৮৯১ অব্দের লোক-গণনায় মুসলমানের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পায়, সেরূপ তাহার পরেও পায় নাই। আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখক ওডোনেল সাহেব এই ঘটনার কারণ-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বলেন—

There is nothing to mar the general progress of the population of Eastern

Bengal, every district and tract showing a great and in most cases a very great increase.—p. 49.

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আদম-সুমারীর মধ্যবর্ত্তী কালে, জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির পথ কণ্টকিত হইতে পারে, পূর্ব্ববঙ্গে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই। কিন্তু ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার জন্য কিরূপ ভীষণ জনসংক্ষয় হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, ঐ সময়ে নদীয়া ও মুরশিদাবাদের বস্ত্র ও রেশম শিল্পের অবনতির জন্যও বহুলোককে বিপন্ন হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের এই সকল বিপদে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমান ক্ষতি হইলেও, হিন্দুর সংখ্যাধিক্য-বশতঃ মোটের উপর হিন্দুর সংখ্যাই অধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান-সংখ্যা প্রকৃতির অনুকূলতায় একেবারে শতকরা প্রায় ১৬ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মোটের উপর মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ৬লক্ষ বাড়িয়া গেল। এইরূপ অসাধারণ সুযোগ না পাইলে সামাজিক বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা এত বাড়িতে পাইত না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

১৮৯১ অব্দের পর পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণ ভীষণ মহামারী ও ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে এক প্রকার অব্যাহতি লাভ করে। তথাপি হুগলী ও ২৪ পরগণায় জল-নিকাশনের সুব্যবস্থা না থাকায় ঐ প্রদেশের বহু লোককে ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করিতে হয়, অনেকে রুগ্নদেহে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। তাহার উপর আবার ১৯০০ অব্দের বন্যায় চব্বিশ পরগণায় শস্য-হানি ঘটে। বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ অব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষপাত হয়। বর্দ্ধমান জেলায় ১৮৯১ অব্দেও একবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। নদীয়া জেলায় দুর্ভিক্ষ ও রোগ উভয়েরই প্রকোপ পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছিল। এই সকল কারণে হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির তাদৃশ সুবিধা ছিল না। তথাপি ১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীতে দেখা যায়, হিন্দুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৬৸৹ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শেষবারের আদম-সুমারীতে মুসলমানের বৃদ্ধির হার শতকরা পূর্ণ ৯ জনও

হয় নাই। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে ১৯০১ অব্দে তাঁহাদিগের বৃদ্ধির হার আরও কিঞ্চিৎ অধিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বারের আদম-সুমারীর মধ্যবর্ত্তীকালে বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে বন্যা ও ঝটিকায় বহু লোকের বিনাশ ঘটে। খুলনায় দুর্ভিক্ষপাত হয়। ময়মনসিংহ জেলায় ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই সকল কারণে মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে আশানুরূপ জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় নাই। তথাপি পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষা তথায় বৃদ্ধির হার অধিক ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে অন্নকষ্ট ও ম্যালেরিয়ার অভাবই এই ঘটনার প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। বন্যা, ঝটিকা ও ওলাউঠার ন্যায় দুর্ঘটনায় একবার বহু লোকের বিনাশ ঘটে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় ধনধান্যপূর্ণ স্বাস্থ্যকর দেশে সে অভাব পূর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব ঘটে না। পক্ষান্তরে ম্যালেরিয়ায় ও অন্নকষ্টে একদিকে যেমন জন-ক্ষয় ঘটে, অন্যদিকে সেইরূপ বহুসংখ্যক লোককে দীর্ঘকালের জন্য রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হইবার পথে এই অবস্থাই বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল। তথাপি ১৯০১ অব্দের লোক-গণনায় হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ব্ববারের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহা কখনই ধ্বংসোন্মুখ জাতির লক্ষণ নহে।

আমরা দেখিলাম, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিতেছে, একথা যথার্থ নহে। আধিদৈবিক বিপদের জন্য মধ্যে কিছুদিন বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছিল। সেই বিপদের অবসানের সহিত আবার হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুর ভয়ের কোনও কারণ নাই। আরও দেখিলাম, মুসলমান-প্রধান প্রদেশে যখন ঐরূপ ভয়ঙ্কর আধিদৈবিক বিপদ ঘটিয়াছে, তখন মুসলমানেরও সংখ্যা-হ্রাস ঘটিয়াছে। হিন্দু-জন-সংখ্যার হ্রাসের সহিত কোনও সামাজিক বা নৈতিক ব্যাপারের কোনও সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইল না। যদি সেরূপ কোনও সম্বন্ধ থাকে, তবে তাহা এত ক্ষীণ যে, বিগত ৪০ বৎসরের জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি-গণনা-কালে তাহা তাদৃশ উল্লেখযোগ্য নহে। মুসলমানের নৈতিক বল যতই অধিক হউক, বংশবৃদ্ধি-ব্যাপারে উহার কোনও কার্য্যকারিতা দেখা যায় না।

মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের অভাব, জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতা ও পাটের চাষে অর্থাগম—এই ত্রিবিধ কারণ মুসলমানের বংশ-বৃদ্ধি-বিষয়ে সবিশেষ সহায়তা করিতেছে। এই কারণ-ত্রয়ের অসদ্ভাব ঘটিলে শুদ্ধ নৈতিক বলে মুসলমান আপনার সংখ্যাগত প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। হিন্দু যখন আধিদৈবিক বিপৎপরম্পরায় দীর্ঘকাল বিজড়িত হইয়া বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা হারাইয়াছিল, সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গে প্রকৃতির আনুকূল্যে মুসলমানের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই ঘটনাকে "ক্ষয় রোগ" নামে নির্দ্দেশ করিলে শব্দশাস্ত্রের অপব্যবহার করা হয়।

---

(১১)

হিন্দুর রোগ-সহিষ্ণুতা।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, হিন্দুদিগের মধ্যে, কি উচ্চ কি নীচ কোনও শ্রেণীতেই ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই; ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার কথাটাই তাহাদের মনে উদিত হয় না। পক্ষান্তরে প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই নীতিশিক্ষা করে। নৈতিক উন্নতির জন্যই দেশে মুসলমানের প্রাধান্য বা সংখ্যাধিক্য ঘটিতেছে। তাঁহার ইহাও বিশ্বাস যে, নৈতিক দুর্ব্বলতার জন্য হিন্দুর রোগ-সহিষ্ণুতাও কম। তিনি বলিতেছেন—

"কলেরাই বল, আর প্লেগই বল, মহামারী উপস্থিত হইলে অধিকসংখ্যক হিন্দুই কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহার কারণ সহজেই অনুমিত হয়। মুসলমানেরা হিন্দুর তুলনায় অপেক্ষাকৃত উত্তম আহার, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং উত্তম বাটীতে অবস্থান করে। এই জন্যই তাহারা সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয় না। যখন পীড়াক্রান্ত হয়, তখন তাহাদিগের সবল দেহ ও মন্দয় (!) স্বাস্থ্য আরোগ্য-লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকে।"

ইহার পর তিনি প্রকারান্তরে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানেরা দীর্ঘজীবী। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বিচার্য্য।

কর্ণেল মহাশয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ; সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার মূল্য অধিক হওয়াই উচিত। কিন্তু বিশাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই যে তিনি দীর্ঘকাল বাস করিয়া এবিষয়ে যথোচিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে। এবিষয়ে বঙ্গের স্যানিটারি কমিশনার বা স্বাস্থ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সংগৃহীত তথ্যসমূহ সমধিক প্রামাণিক বলিয়া আমার মনে হয়। এই কারণে আমি তাঁহার সংগৃহীত বার্ষিক মৃত্যু-তালিকা হইতে একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। বিগত ১৯০১ অব্দ হইতে ১৯০৮ অব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসরে কোন্ জেলায় হাজারকরা কত হিন্দু ও মুসলমান মৃত্যুমুখে পাতিত হইয়াছে, তাহা এই তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যাইবে। প্রথমে পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলির তালিকাই উদ্ধৃত হইল—

জেলা	হিন্দু	মুসলমান
বর্দ্ধমান	২৮৩'৪৯	২৯৫'৮১
হুগলি	২৯১'১২	২৯৩'৮৬
নদীয়া	৩১৭'৭৪	৩৩৬'৯৫
যশোহর	২৮৩'১৮	৩১০'০৬
খুলনা	২৪৩'৫২	২৮০'৪২
২৪ পরগণা	২২৯'২৪	২২৯'৭১
বীরভূম	২৯৪'০০	২৬৩'৬৯
বাঁকুড়া	২৫৪'৩৩	২৪৮'৬৭
মেদিনীপুর	২৭০'৫১	২৫৩'৪৬
হাবড়া	২৬৯'৭৪	২৬৪'৮১
কলিকাতা	৩০০'৮৮	২৬৯'৫৪
মুরশিদাবাদ	৩১১'০৪	৩০০'৩০

এই তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, পশ্চিম বঙ্গের ৭টি জেলায় মুসলমানের মৃত্যুর হার হিন্দুর অপেক্ষা অধিক ও ৭টি জেলায় হিন্দুর অপেক্ষা কম। সুতরাং স্বভাবতঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের রোগাক্রমণ সহ্য করিবার শক্তি অধিক,

এমন সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া স্থাপন করিব ? পূর্ব্ববঙ্গের সম্বন্ধেও সেই কথা ; বরং পূর্ব্ব-বঙ্গে হিন্দুরই রোগাক্রমণ-সহিষ্ণুতা অধিকতর। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে তথায় হিন্দু-মুসলমানের মৃত্যুর হার কিরূপ ছিল, দেখুন—

(১৯০১ সাল হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত)

জেলা	হিন্দু	মুসলমান
রাজসাহী	১২৬·৯১	১৫২·৩৪
জলপাইগুড়ি	১৩৩·১৯	১৫২.০৫
দার্জ্জিলিঙ	১৬৫·০১	১৭১·৪৫
রঙ্গপুর	১১৮·৮৯	১৩০·১৯
বগুড়া	১০৭·৫৮	১১৭·৮১
পাবনা	১২৪·৫০	১৩৯·৫৮
ফরিদপুর	১৩৯·৮৪	১৫১·১৭
বাখরগঞ্জ	১১৯·৪৬	১৪২·৬৮
নোয়াখালি	১১৫·৫৫	১৩১·২৫
চট্টগ্রাম	১১৮·১৯	১২৮·৬২
দিনাজপুর	১৭২·৫১	১৬২·৬৯
ঢাকা	১২৫·৮৭	১২৫·২০
ময়মনসিংহ	১১২·২০	৯৫·৯৫
ত্রিপুরা	১০২·৭৭	৯৫·৩৫

এই তালিকায় নেত্রপাত করিলে কর্ণেল মহাশয় বোধ হয় বিস্মিত হইবেন। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ব্ব বঙ্গের ১৩টি জেলার মধ্যে চারিটি ভিন্ন সর্ব্বত্রই মুসলমানের মৃত্যুর হার হিন্দুর অপেক্ষা অধিক।

এক্ষণে সরকারী রিপোর্ট হইতে বঙ্গভঙ্গের পরবর্ত্তী ৪ বৎসরের মৃত্যুর একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

(হাজার করা মৃত্যুর অনুপাত।)

	হিন্দু	মুসলমান
১৯০৫ অব্দ	৩৩.০৩	৩৬.৩৮
১৯০৬ „	৩২.৩৬	৩০.৬৫
১৯০৭ „	২৭.৩০	৩০.১২
১৯০৮ „	২৯.৮৫	৩০.৫৩

কর্ণেল মহাশয় আজীবন ডাক্তারী করিয়াছেন; সুতরাং স্যানিটারি কমিশনার মহাশয়ের রিপোর্টের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই, এমন কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? তথাপি তিনি তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন নাই কেন, বুঝিলাম না। সে যাহা হউক, হিন্দুর এই রোগাক্রমণ-সহিষ্ণুতার কারণ কি? ইহা হিন্দুর নৈতিক বলের অথবা নৈতিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক?

মুসলমানের অপেক্ষা যে হিন্দু অধিকতর দীর্ঘজীবী, একথা ১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণের ১৭০ পৃষ্ঠায় মিঃ ওডোনেল স্বীকার করিয়াছেন। ওডোনেল সাহেবের কথায় বিশ্বাস না হয়, ১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীর তালিকা হইতে অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। আদম-সুমারীর বিবরণ-পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠায় নেত্রপাত করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ষষ্টি ও তদধিক-বয়স্ক লোকের সংখ্যা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান-সমাজে এইরূপ :—

(প্রতি এক লক্ষ জনের মধ্যে—সমগ্র বঙ্গে)

	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
হিন্দু	৪,৬৫১	৬,২১৯
মুসলমান	৪,২৫৪	৪,৭৬৯
খ্রীষ্টান	৩,৬০২	৪,২৫২

ষষ্টি ও তদধিক-বর্ষবয়স্ক লোকের অনুপাত হিন্দুসমাজেই যখন অধিক দৃষ্ট হইতেছে, তখন হিন্দুকেই মুসলমান অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবী বলিতে হইতেছে। উল্লিখিত তালিকাটি সমগ্র বঙ্গ-বিষয়ক। এখন সামাজিক বঙ্গের হিসাব দেখুন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সামাজিক বঙ্গে মোট হিন্দুর সংখ্যা ২,২৭,৪৩,৪১০

ও মুসলমানের সংখ্যা ২,৩৩,২৬,৯৮০। বঙ্গীয় আদম-সুমারীর তালিকা-গ্রন্থের ৩৪ পৃঃ হইতে ৪৩ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত এবং ৪৬ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় ষষ্টি ও তদুর্দ্ধ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের যে সংখ্যা তালিকাকারে মুদ্রিত আছে, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, সামাজিক বঙ্গের হিন্দুসম্প্রদায়ে ৬০ ও তদধিকবয়স্ক লোকের সংখ্যা ১২ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০১ ও মুসলমান সম্প্রদায়ে ঐরূপ লোকের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৭৫ জন আছে। সহজে বুঝিবার সুবিধার জন্য অঙ্কগুলি তালিকার আকারে প্রকাশ করিলাম।—

	মোট জনসংখ্যা।	৬০ ও তদুর্দ্ধবয়স্ক লোকের সংখ্যা।
হিন্দু	২,২৭,৪৩,৪১০	১২,১৮,৯০১
মুসলমান	২,৩৩,২৬,৯৮০	৯,৯৭,৭৭৫
		২,২১,১২৬ হিন্দু অধিক।

সামাজিক বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা প্রায় ৬ লক্ষ কম হইলেও তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধের সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা ২ লক্ষ ২১ হাজার অধিক। ইহা কি হিন্দুর দীর্ঘজীবিতার প্রমাণ নহে? সমগ্র সামাজিক বঙ্গের মোট সংখ্যার যদি সমধিক নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জেলার সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়া বিচার করুন। দেখিবেন, প্রায় সকল জেলাতেই দীর্ঘজীবী হিন্দুর সংখ্যা অধিক। আমি স্থানাভাবে দুইটি-মাত্র মুসলমান-প্রধান জেলার হিসাব উদাহরণ-স্বরূপ এস্থলে পাঠকগণের গোচর করিলাম :—

	মোট হিন্দু	বৃদ্ধের সংখ্যা	হাজারকরা অনুপাত
ঢাকা	৪,৮৭,২৭৪	২৭,০০৭	৫৫.৪২
রঙ্গপুর	৪,১৩,৩৪২	১৯,৮৯৬	৪৮.১১

	মোট মুসলমান	বৃদ্ধের সংখ্যা	হাজারকরা অনুপাত
ঢাকা	৮,১৯,৫৮৭	৩৫,৩৫৮	৪৩.১৪
রঙ্গপুর	৭,০৮,১০৫	২৮,১৪৬	৩৯.৭৪

হিন্দুর দীর্ঘজীবিতার এতদপেক্ষা আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে?

মুসলমান সমাজে দীর্ঘজীবিনী রমণীর সংখ্যা স্বভাবতঃ অল্প বলিয়া এস্থলে কেবল পুরুষের হিসাবই প্রকাশিত হইল। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, ঢাকার ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থানেও বৃদ্ধ মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় হাজারকরা ৭ জন কম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে হিন্দুর এই দীর্ঘজীবিতা কি নীতি-হীনতার ফল? কর্ণেল মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়া মানব-জীবনের অনেক গূঢ়তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি কি হিন্দুর নীতি-হীনতাকেই তাহার রোগ সহিষ্ণুতা ও দীর্ঘজীবিতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন?

(১২)

শিক্ষাদির কথা।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে হিন্দু যে কেবল মুসলমানের অপেক্ষা জন-শক্তিতে ও নৈতিক গুণেই হীন, তাহা নহে, ধনবত্তাতেও হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা হীন ও শিক্ষায় তদপেক্ষা অগ্রসর নহে। ধনবত্তা সম্বন্ধে কর্ণেল মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কতদূর সমীচীন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে ১৮৯১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখক ওডোনেল সাহেব লিখিয়াছিলেন, "হিন্দু যে সাধারণতঃ মুসলমানের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবী, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহারা মুসলমানের অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক সঙ্গতিপন্ন।" হইতে পারে, বিগত কুড়ি বৎসরে পাটের চাষের বৃদ্ধির সহিত মুসলমানের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে।

শিক্ষা বা বিদ্যাভ্যাস-সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি এই—

"বিদ্যাভ্যাস উভয় জাতির মধ্যে সমভাবে প্রচলিত আছে বলিলেই হয়। হাজারকরা ৭৮ জন হিন্দু এবং হাজার করা ৫৪ জন মুসলমান বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে।" (৬৭ পৃঃ)।

"অর্থাৎ এক হাজারের মধ্যে ৯৪৬ জন মুসলমান নিরক্ষর আর এক হাজারের মধ্যে ৯২২ জন হিন্দু মূর্খ।" (৬১ পৃঃ)।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমদর্শিতার গুণে হাজার করা (৭৮—৫৪=) ২৪ জনের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বলিয়াই গণ্য হয় নাই ! কিন্তু গণিতজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন যে, ৭৮ ও ৫৪=এই দুই অঙ্কের মধ্যে অনুপাতানুসারে প্রায় এক তৃতীয়াংশের পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ ২৭×২=৫৪ ও ২৭×৩=৮১। হিন্দুর অনুপাত হাজারকরা ৮১ হইলে মুসলমানের ঠিক তৃতীয়াংশ অধিক হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া হিন্দুর অনুপাত ৭৮ জন (৩জন কম) হইয়াছে। সুতরাং হাজার করা যতজন মুসলমান বিদ্যাশিক্ষা করে, তদপেক্ষা প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিক হিন্দু বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে, দেখা যাইতেছে। কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অম্লান-বদনে বলিয়াছেন যে, উভয় জাতির মধ্যে বিদ্যা শিক্ষা সমভাবে প্রচলিত আছে বলিলেই হয় !

মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি এই সংখ্যা-সংগ্রহ-ব্যাপারেও বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গেট সাহেব প্রণীত আদম-সুমারীর বিবরণ-গ্রন্থের ৩০৫ পৃষ্ঠার ৮ম ও ৯ম স্তম্ভে দৃষ্ট হইল, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা লোকের হাজারকরা অনুপাত এইরূপ লিখিত আছে, :—

	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৭৮.৪	৪.৮
মুসলমান	৫৪.৭	১.২

(শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সংখ্যা এই তালিকায় ধরা হয় নাই।)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকের সংখ্যা উদ্ধৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন; অথবা ৯ম স্তম্ভস্থিত অঙ্কে তাঁহার দৃষ্টিই নিপতিত হয় নাই ! উভয় সমাজের বাঙ্গালা জানা স্ত্রীপুরুষের হার একত্র করিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, মুসলমানের অনুপাতে এক তৃতীয়াংশ অধিক হিন্দুই বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে।

বিদ্যা-শিক্ষা-সম্বন্ধে উভয় সমাজের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইলে আর একটু সূক্ষ্মভাবে আদম-সুমারীর তালিকায় দৃষ্টিপাত আবশ্যক। পাঠকদিগের

বুঝিবার সুবিধার জন্য আমি পূর্ব্বোক্ত আদম-সুমারীর বিবরণ-গ্রন্থের ৩০৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তালিকা হইতেই আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(বয়সানুসারে বাঙ্গালা জানা লোকের অনুপাত)

বয়স	হিন্দু পুরুষ		হিন্দু স্ত্রী
১—১০ বর্ষ	১৮·৮	হাজারকরা	১·৭
১০—১৫ ,,	৮৮·০	,,	৭·৩
১৫—২০ ,,	১১০·০	,,	৯·৯
২০—তদধিক	১০১·১	,,	৫ ৩

মুসলমানের অনুপাত।

	পুরুষ		স্ত্রী
১—১০ বর্ষ	৭·৫	হাজারকরা	০·৬
১০—১৫ ,,	৪৯·৮	,,	১·৮
১৫—২০ ,,	৭৫·৪	,,	১·৮
২০—তদধিক	৮৩·৫	,,	১·৬

(শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।)

অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার প্রবৃত্তি কোন্ সমাজে অধিক, তাহা উদ্ধৃত তালিকায় নেত্রপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি এই তালিকায় দৃষ্টিপাত করেন নাই? অথবা এই তালিকা দেখিয়াই উভয় সমাজে বিদ্যাভ্যাস সমভাবে প্রচলিত আছে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

এই গেল অনুপাতের কথা। এক্ষণে গেট সাহেবের সংকলিত আদম-সুমারীর তালিকা-পুস্তকের (Tables. pt II.) ৬১ পৃষ্ঠা হইতে বাঙ্গালা জানা হিন্দু-মুসলমানের মোট সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

	হিন্দু		মুসলমান	
বয়স	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১—১০ বর্ষ	১,২৬,৪০২	১১,১৬৬	৩০,৪৯৭	২,১২০
১০—১৫ „	২,৬৬,১৫০	১৮,০৬৪	৮১,৪৮৯	২,২৪৪
১৫—২০ „	২,৩৭,৪১১	২১,১৪৫	৭৯,৫১৪	২,৩১০
২০—তদধিক	১৩,১১,২৮৩	৭২,৪৫৪	৫,১২,৪৬০	৯,১১৭
	১৯,৪১,২৪৬	১,২২,৮২৯	৭,০৩,৯৬০	১৫,৭৯১
ব্রাহ্ম	৯৮৮	৬৯৬		

এই তালিকায় বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গালা জানা হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট কাছাড় ও আসামে বাঙ্গালা জানা হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা কত, এক্ষণে তাহা দেখুন—

(আসামের আদম-সুমারীর তালিকা-গ্রন্থের ৩৪।৫ পৃষ্ঠ হইতে সংকলিত।)

	হিন্দু	মুসলমান
পুরুষ	১,০৪,৬৮০	২৯,৩৪৬
স্ত্রী	৫,৯৬১	৮২৫
	১,১০,৬৪১	৩০,১৭১

সুতরাং বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে বাঙ্গালা জানা হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইতেছে :—

বাঙ্গালী	পুরুষ	স্ত্রীলোক
হিন্দু	২০,৪৬,৯১৪	১,২৯,৪৮৬
মুসলমান	৭,৩৩,৩০৬	১৬,৬১৬

এতদ্ভিন্ন উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ ভারতে ও ব্রহ্মদেশে যে সকল বাঙ্গালী হিন্দু আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই লেখাপড়া জানা লোক। কারণ, তাঁহাদিগের

অনেকেই চাকুরী উপলক্ষেই ঐ সকল দেশে গিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্রহ্মদেশে শ্রমজীবী ও খালাসীর কার্য্য করে। এই প্রবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা কত, তাহা আদম-সুমারীর বিবরণে লিখিত হয় নাই। তথাপি প্রবাসী হিন্দু-মুসলমানের জীবনোপায়ের বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয় যে, প্রবাসী শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান অপেক্ষা প্রবাসী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুর সংখ্যা অনেক অধিক হইবে, সন্দেহ নাই। উপরে যে সংখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রবাসী শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা যোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালী হিন্দু সংখ্যায় বাঙ্গালী মুসলমান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন হইলেও, বাঙ্গালা জানা হিন্দু পুরুষের অনুপাত ঐ শ্রেণীর মুসলমান অপেক্ষা অন্যূন তিন গুণ অধিক, এবং লেখাপড়া জানা হিন্দু নারীর সংখ্যা ঐ শ্রেণীর মুসলমান রমণী অপেক্ষা অন্যূন অষ্ট গুণ অধিক!

ইতঃপূর্ব্বে ৮০পৃষ্ঠায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু-মুসলমানের যে অনুপাত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত নহে—উহা বাঙ্গালী,বিহারী,উড়িয়া ও ছোটনাগপুরী হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষা-বিষয়ক স্থূল অনুপাত। কিন্তু বিহারী ও উড়িয়া অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দু শিক্ষাবিষয়ে অধিকতর অগ্রসর। কাজেই ঐ তালিকায় মুদ্রিত অনুপাতের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালীর শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা-নির্ণয় করা সঙ্গত নহে। প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কত জন লেখাপড়া জানে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরবাসী বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার হিন্দু-মুসলমানের স্থূল অনুপাতাঙ্কগুলি আংশিক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দুরা শিক্ষা-বিষয়ে মুসলমানের প্রায় সমতুল্য! শিক্ষা-বিষয়ে হিন্দুগণ যে মুসলমান অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর নহে, ইহা পাঠকের চিত্তে মুদ্রিত করিবার জন্য তিনি আর একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "এক হাজারের মধ্যে ৯৪৬ জন মুসলমান নিরক্ষর আর এক হাজারের মধ্যে ৯২২ জন হিন্দু মূর্খ।" কথাটা এইরূপ উল্টাইয়া বলিলে স্বল্পবুদ্ধি লোকের ভ্রান্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু মেধাবী বাঙ্গালী হিন্দু পাঠক এরূপ

কৌশলে কখনও বিভ্রান্ত হইবেন না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। যদি কথাটী উল্টাইয়াই বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, নিরক্ষর বাঙ্গালী হিন্দুর মোট সংখ্যা ১,৯৭,৫৫,৬০০ ও নিরক্ষর বাঙ্গালী মুসলমানের মোট সংখ্যা ২,২১,৮৯,০০০। অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ অপেক্ষা বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৩৩॥০ হাজার অধিক ! অথচ ঐ সকল প্রদেশের মোট মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা ১০ লক্ষ ৭ হাজার মাত্র অধিক।

অতঃপর উচ্চ শিক্ষার কথা। তৎসম্বন্ধে কর্ণেল মহাশয়ের উক্তি এই :—

"উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে উভয় জাতির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে—উচ্চবর্ণের হিন্দুরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের—যাহারা সমগ্র হিন্দু-সমাজের অর্দ্ধাংশেরও অধিক,—তাহাদিগের মধ্যে অজ্ঞ লোকের সংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা অধিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।"—৭৮ পৃঃ।

"হিন্দুদিগের যে কিছু জ্ঞান আছে বা ছিল, বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা সমগ্র হিন্দু-সমাজের অল্পাংশের মধ্যে নিবদ্ধ আছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই অবস্থা ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আর এই পরিবর্ত্তনে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরাই অধিকতর লাভবান্ হইয়াছে।" ৬৮ পৃঃ

পৃথিবীর সকল দেশেই সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচার অপেক্ষাকৃত অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডেও শ্রমজীবী বা শ্রম-শিল্প-জীবী অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার কি অধিক নহে ? উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান কি সকল দেশেই স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে ? বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজেই কি উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সমধিক বিস্তৃত ? মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে অজ্ঞ লোকের সংখ্যা মুসলমানদিগের ঐ শ্রেণীর লোকের অপেক্ষা অধিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার এরূপ অনুমানের কারণ কি ? আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখকেরা কি কেহ ঐরূপ কথা বলিয়াছেন ? আদম-সুমারীর তালিকায় ঐরূপ অনুমানের অনুকূল কোনও তথ্য কি লিপিবদ্ধ দেখা যায় ? অথবা হিন্দুজাতির

মঙ্গল-কামনায় উদ্ভাবিত অন্যান্য অনুমানের মত কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অনুমানটিও বিশুদ্ধ কল্পনা-সম্ভূত ?

দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্তোষ-জনক কোনও প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে যেরূপ তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন, তাহা আদম-সুমারীর তালিকায় সংগৃহীত হয় নাই। তথাপি Education by selected Castes, tribes and races-শীর্ষক তালিকার ১১শ ও ১২শ স্তম্ভে আদম-সুমারীর কর্তৃপক্ষ যে সকল সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে প্রকৃত অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারা যায়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "১০০ জন হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে ৬ জন ব্রাহ্মণ, ৫ জন কায়স্থ, বৈদ্য ও ক্ষত্রিয় মিলিয়া একজনের কিছু বেশী এই চারি জাতি সচরাচর ভদ্রলোক বলিয়া আখ্যাত। ইহারা শতকরা হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে ১৩ জন।" (হিন্দুসমাজ নিবেদন—পত্র ১২ পৃঃ) "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"-শীর্ষক পুস্তকে তিনি ঐ শতকরা ১৩ জন লোককেই উচ্চবর্ণের হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৬১ ও ৮৮ পৃঃ) এ বিষয়ে আমারও কোনও আপত্তি নাই। এক্ষণে এই উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে কত জন লেখাপড়া জানে, তাহা প্রথমতঃ দেখা যাউক :—

সমগ্র বঙ্গে	পুরুষ	স্ত্রী
ব্রাহ্মণ	৩,৩৭,২০৪	২৯,০২১
কায়স্থ	২,২৮,১৯১	৩৪,২৯০
বৈদ্য	১০,২৫৫	৩,৯৯৭
ক্ষত্রিয়	২,৬১৬	১৪০
মোট—	৫,৭৮,২৬৬	৬৭,৪৪৮
	৬৭,৭১২	
সর্ব্বশুদ্ধ—	৬,৪৫,৯৭৮	

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানে, এমন হিন্দু নর-নারীর মোট সংখ্যা (১৯,৪১,২৪৬+১,২২,৮২৯=) ২০,৬৪,০৭৫। ইহার সহিত

ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা যোগ করিলে মোট ২০ লক্ষ ৬৫৫০ লক্ষ হয়। এই সংখ্যা হইতে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা বাদ দিলে কত থাকে, দেখুন—

মোট শিক্ষিত হিন্দু	২০,৬৫,৭৬৯	
উচ্চ জাতীয় শিক্ষিত হিন্দু	৬,৪৫,৯৭৮	
অবশিষ্ট	১৪,১৯,৭৯১	নিম্নশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু।

[এস্থলে "শিক্ষিত" পদটি "বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা"—অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।]

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, খাস বাঙ্গালায় লেখাপড়া জানা মুসলমান নরনারীর মোট সংখ্যা (৭,০৩,৬৯০ + ১৫,৭৯১ =) ৭,১৯,৭৫১ জনের অধিক নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা মোট মুসলমানের লেখাপড়া জানা লোকের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ! মোটের উপর মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের মোট সংখ্যা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যার অর্দ্ধেক! তথাপি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে অজ্ঞ লোকের সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা অধিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।" তাঁহার এই উক্তি যে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি-মূলক, তাহা বলাই বাহুল্য।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন,—"একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে হিন্দুর শিক্ষা-সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব আরও আবিষ্কৃত হইতে পারে।" সে "গূঢ়তত্ত্ব" এই যে, হিন্দু-সমাজের উচ্চস্তর অপেক্ষা নিম্নস্তরে শিক্ষার প্রচার অল্প। এই ব্যাপারকে মুখোপাধ্যায় মহাশয় "গূঢ়তত্ত্ব" বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। বলিয়াছি, সকল দেশের সকল সমাজেই নিম্নস্তর অপেক্ষা উচ্চস্তরেই শিক্ষার বিস্তার অধিক। এরূপ একটি সর্ব্বজন-বিদিত তত্ত্বকে কর্ণেল মুখোপাধ্যায় নবাবিষ্কৃত 'গূঢ়তত্ত্ব' বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করিলেন? সে যাহা হউক, এই গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার-জনিত উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এদেশের নবশাক ও তন্নিম্নবর্ত্তী স্তরভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির লেখাপড়া জানা লোকের যে অনুপাত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রমের বাহুল্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের তালিকা এই :—

কুমার	হাজার করা	৩৪ জন (?)	বাগদী	হাজার করা	১৬ জন।
জেলিয়া	,,	৪৩ জন।	ডোম	,,	১২ জন (?)
ধোপা	,,	২৬ জন (?)	হাড়ী	,,	১০ জন (?)
তেওর	,,	২৮ জন।	চামার	,,	৬ জন (?)
নমঃশূদ্র	,,	৩৩ জন।	মুচি	,,	৮ জন।
কাওরা	..	৩১ জন।	মসলমান মুচি	,,	৫১ জন (?)

তালিকার শেষে কেবল মুসলমান মুচির শিক্ষার অনুপাতটি নির্দ্দেশ করিয়াই মুখোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দু-সমাজে অজ্ঞানতা অধিক পরিমাণে আছে।" (৬২ পৃষ্ঠা) জিজ্ঞাসা করি, সেই জন্যই কি লেখাপড়া জানা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা আদম-সুমারীর সময় উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর লেখাপড়া জানা মুসলমানের সংখ্যার দ্বিগুণ হইয়াছে?

আর এক কথা। বাঙ্গালী মুসলমান মুচির মধ্যে হাজার করা ৫১ জন লেখা পড়া জানে, এই অমূল্য তথ্যটি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোথায় পাইলেন? তাঁহার এই অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, দ্বারবঙ্গের মুসলমান মুচিদিগের সম্বন্ধে আদম-সুমারীর তালিকায় (১০৮ পৃঃ দ্বিতীয় ভাগ) ঐরূপ কথা লেখা আছে; কর্ণেল মহাশয় তাহাদিগকে বাঙ্গালী মুসলমান বলিয়া ধরিয়া লইয়া অথবা মনে করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন! হিন্দুকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্যই এস্থলে দ্বারবঙ্গের হিন্দীভাষী মুসলমান মুচিদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এমন কথা আমি বলি না; সম্ভবতঃ তাঁহার অনবধানতা-বশতই এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এরূপ অনবধানতা কি ভয়ানক দোষাবহ নহে?

এক্ষণে পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকার সংকলনে তিনি যে সকল ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে, আদম-সুমারীর বিবরণ-বিষয়ক গ্রন্থের (৩০৯ পৃষ্ঠস্থিত) যে তালিকা হইতে তিনি ঐ অনুপাতাঙ্ক সংকলন করিয়াছেন, তাহা নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষা-

বিষয়ক তালিকা নহে। বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি ভিন্ন-ভাষা-ভাষী নিম্ন-জাতীয় হিন্দুর সংখ্যাও ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ঐ তালিকার শীর্ষদেশে শেষ-স্তম্ভে যে whole Province কথাটি লিখিত আছে, তাহা বোধ হয় কর্ণেল মহোদয়ের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই। নিম্নশ্রেণীয় বাঙ্গালী-হিন্দুর মধ্যে শিক্ষার প্রসার কিরূপ, তাহার বিস্তারিত পরিচয় জানিতে হইলে, আদমসুমারীর তালিকা-গ্রন্থের (Pt. II. Tables) নবম তালিকায় নেত্রপাত করা আবশ্যক। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ তালিকার অস্তিত্বের বিষয় অবগত আছেন কি না জানি না; কিন্তু ঐ তালিকায় মুদ্রিত সংখ্যায় নেত্রপাত করিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী-হিন্দুর মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাত, তাঁহার প্রদর্শিত অনুপাত অপেক্ষা অনেক অধিক।

কর্ণেল মহোদয় হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষার অনুপাত নির্দ্দেশকালে যে পদ্ধতির অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে সে পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। ঐ প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু-মুসলমান পুরুষের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাত কত, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন; স্ত্রীলোকের সংখ্যা ধরেন নাই। কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুর শিক্ষা-বিষয়ক অনুপাত নির্দ্দেশকালে তিনি স্ত্রীপুরুষের মিলিত সংখ্যার অনুপাতাঙ্কগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন! বলা বাহুল্য, আদম-সুমারীর অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ অনুপাতাঙ্কগুলির সহিত প্রত্যেক সমাজের স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার অনুপাত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। কারণ, তাহা না করিলে সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না। এদেশে কি হিন্দু কি মুসলমান, কোনও সমাজেই স্ত্রী-শিক্ষার তাদৃশ প্রচার নাই। এই কারণে উভয় সমাজেই নিরক্ষর রমণীর সংখ্যা-বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। সেই নিরক্ষর রমণীগণের সংখ্যা নিরক্ষর পুরুষগণের সংখ্যার সহিত যুক্ত হইলে লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাতাঙ্ক নিতান্তই কমিয়া যায়। এই কারণে, গেট মহোদয় স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত অনুপাতাঙ্ক ও পৃথক্ পৃথক্ অনুপাতাঙ্ক স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন। আমি তাঁহার রচিত তালিকা হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্ব্বাচিত জাতি কয়টির পৃথক্ পৃথক্

অনুপাতাঙ্ক যথাবৎ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইলে পাঠকগণ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

(আদম-সুমারীর বিবরণ গ্রন্থের ৩০৯ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত।)

জাতির নাম	লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাত।		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কুমার	হাজারকরা ৩৪	হাজারকরা ৬৭	হাজারকরা ২ জন।
জেলিয়া	,, ৪৩	,, ৮৪	,, ২ জন।
ধোপা	,, ২৬	,, ৫১	,, ১ জন।
তেওর	,, ২৮	,, ৩৩	,, ১০ জন।
নমঃশূদ্র	,, ৩৩	,, ৬৪	,, ১ জন।
কাওরা	,, ৩১	,, ৪২	,, ২১ জন।
বাগ্দী	,, ১৬	,, ৩০	,, ২ জন।
ডোম	,, ১২	,, ২৪	,, ১ জন।
হাড়ী	,, ১০	,, ১৯	,, ১ জন।
চামার	,, ৬	,, ১২	,, ...
মুচি	৮	,, ১৫	,, ১ জন।

উদ্ধৃত তালিকায় নেত্রপাত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার কেবল দ্বিতীয় স্তম্ভের অনুপাতাঙ্কগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বীয় পুস্তিকার ৬১ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষা-বিষয়ক অনুপাত নির্দ্দেশকালে তিনি যদি উভয় সমাজের স্ত্রী-পুরুষের মোট অনুপাতাঙ্ক উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, বঙ্গদেশে লেখাপড়া জানা হিন্দু-নরনারীর অনুপাত হাজারকরা ৬৬ ও ঐরূপ মুসলানের অনুপাত হাজারকরা ৩৫ মাত্র। (গেটসাহেবের রিপোর্টের ৩০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সে অঙ্ক উদ্ধৃত করিতে গেলে আর "বিদ্যাভ্যাস উভয় জাতির মধ্যে সমভাবে প্রচলিত আছে" একথা বলা চলে না। সেই জন্যই হউক, অথবা অন্য কোনও কারণে হউক, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ ক্ষেত্রে কেবল উভয় সমাজের লেখাপড়া জানা পুরুষের অনুপাত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাত কিরূপ, তাহার নির্দ্দেশকালেও তিনি কেবল পুরুষের অনুপাতাঙ্কগুলিই পাঠকের গোচর করিয়াছেন। (৬১ পৃঃ) সেইরূপ যদি তিনি কেবল লেখাপড়া জানা পুরুষের অনুপাতাঙ্ক প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের অনুপাত নিতান্ত কম বলিয়া পাঠকের নিকট প্রতিভাত হইত না। কিন্তু কর্ণেল মহোদয় এক্ষেত্রে ৬১ পৃষ্ঠায় অবলম্বিত পদ্ধতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিম্নবর্ণের হিন্দুর লেখাপড়া জানা স্ত্রী-পুরুষের মোট গড়পড়তার সংখ্যাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে বিদ্যাভ্যাসকারীর অনুপাত নিতান্ত অল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। এইরূপে ৬১ ও ৬২ পৃষ্ঠার অনুপাতাঙ্কের সঙ্কলনে দুই বিভিন্ন রীতির অনুসরণ করা ও তাহার পর "হিন্দুর শিক্ষা-সম্বন্ধে গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার" করিবার ভাণ করিয়া পাঠকের ভ্রান্তি উৎপাদন করা কি কর্ণেল মহাশয়ের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে ?

কিন্তু এইখানেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদের শেষ নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-ছোট নাগপুর-সংবলিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধিবাসী যাবতীয় কুমার, ধোপা, ডোম প্রভৃতির শিক্ষা-বিষয়ক অনুপাতাঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া ঐ অঙ্কগুলিকেই বাঙ্গালী কুমার, বাঙ্গালী ধোপা ও ডোম প্রভৃতির শিক্ষা-বিষয়ক অনুপাতাঙ্ক বলিয়া পাঠকবর্গের ভ্রমোৎপাদন করিয়াছেন। এই কারণে, আদম-সুমারীর তালিকা-গ্রন্থের নবম তালিকায় বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কুমার, ধোপা, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি জাতির শিক্ষা-বিষয়ক যে সকল অঙ্ক মুদ্রিত আছে, তাহা হইতে আমি পর পৃষ্ঠায় কেবল বঙ্গীয় কুমার ধোপা প্রভৃতির অঙ্কগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। তৎপ্রতি নেত্রপাত করিলে পাঠক নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষা-বিষয়ক দশ বৎসর পূর্ব্বেকার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। অনুপাতাঙ্কগুলি মূল গ্রন্থে নাই, পাঠকের সুবিধার জন্য আমি সেগুলি কষিয়া দিয়াছি।

পাঠক এখন একবার এই তালিকার লেখাপড়া জানা স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতাঙ্কের সহিত পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সমগ্র বঙ্গের (বিহার উড়িষ্যা সহ) কুমারাদি জাতির স্ত্রী-

	মোট জন-সংখ্যা			হাজারকরা অঙ্ক		
জাতির	পুরুষ	স্ত্রী		স্ত্রী		স্ত্রী
কুমার	৯৯,৬৬২	৯৫,৮৭১	৪২২	৩৯৮	১২	
ধোপা	৮৪,১১২	৭৮,২৯৮		২১৯		২.৭৯
	৭০,৮৮৯	৬৭,৩২৪				
	৫৫,১০৬	৫৪,০২৮	৪৯	৬৮		
	৫৮,৭১৫	৩৭,৬৭৬	৯৬			
মুচি	৬৯,২৭৮	১,৫৭,৪৭৮	২,৫			

পুরুষের অনুপাতাঙ্কের ও ৮৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত অঙ্কের তুলনা করিয়া দেখুন ; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণিত অবস্থার সহিত প্রকৃত অবস্থার প্রভেদ কিরূপ গুরুতর। এক্ষণে খাস বাঙ্গালার হিন্দু নাপিত মুসলমান নাপিত (হজ্জাম), হিন্দু তাঁতি মুসলমান তাঁতি (জোলা) হিন্দু ধোপা মুসলমান ধোবী, হিন্দু কলু ও মুসলমান কুলু প্রভৃতি জাতির মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাত কিরূপ, তাহা পূর্ব্বোক্ত আদম-সুমারীর নবম তালিকায় মুদ্রিত অঙ্কাবলম্বনে নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি :—

হাজার করা

		পুরুষ	স্ত্রী
নাপিত	(হিন্দু)	১৮৭.০০ জন	৫.৮৪ জন
,,	(মুসলমান)	২১.০০ ,,	২২ ,,
তাঁতি	(হিন্দু)	২০৬,২৬ ,,	১0.৭ ,,
জোলা	(মুসলমান)	৫১.৮০ ,,	১.৩ ,,
ধোপা	(হিন্দু)	১০৩.৪৫ ,,	২৮ ,,
,,	(মুসলমান)	৪০.১৫ ,,	... ,,
কলু	(হিন্দু)	২০১ ২৯ ,,	৪.১২ ,,
ঐ	(মুসলমান)	৪৩.৬৪ ,,	১.24 ,,

এখনও কি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিবেন যে, "নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে অজ্ঞ লোকের সংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা অধিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয় ?" অথবা যখন মোটের উপর সংখ্যায় কম হইয়াও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শিক্ষাপ্রাপ্ত সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ, তখন আর এ প্রশ্নের প্রয়োজন কি ?

এক্ষণে এবিষয়ে কর্ণেল মহাশয়ের শেষ উক্তির আলোচনা করা যাইতেছে। তাঁহার উক্তি এই :—দশবৎসর পূর্ব্বে এই অবস্থা ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আর এই পরিবর্ত্তনে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরাই অধিকতর লাভবান্ হইয়াছে।" তাঁহার এই সিদ্ধান্তের মূল কি, তাহা জানি

না। তবে সরকারি শিক্ষা-বিবরণীতে এবিষয়ে যে সকল তথ্য সংগৃহীত দেখা যায়, তাহা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমানের প্রাধান্য নানা বিষয়েই অধিক; এই কারণে ঐ প্রদেশের হিন্দু মুসলমানের ছাত্র-সংখ্যা General Report of Public Instruction in E. B. and A. for 1908—1909 নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা-বিষয়ে কোন্ সমাজ অগ্রসর, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।—

	জন-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	হাজার করা
হিন্দু	১,১৬,৩৯,৪৯১	৩,৯৭,৭০৪	৩৪.১৭
মুসলমান	১৭৮,৬৮,৪৫২	৫,২১,৭৬৭	২৯.১৪
মুসলমান	৬২,২৮,৯৬১ অধিক	১,২৪,০৬৩ মুসলমান অধিক	৫.০৩ হিন্দু অধিক

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিগত ১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীর পরবর্ত্তী নয় বৎসরে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে অন্য বিষয়ে মুসলমানের যতই উন্নতি ঘটিয়া থাকুক, শিক্ষা-বিষয়ে তাহারা অদ্যাপি হিন্দুদিগের অপেক্ষা হাজার করা ৫ জনেরও অধিক পশ্চাৎপদ রহিয়াছে।

হিন্দুসমাজে শিক্ষার এইরূপ অধিক প্রচার-হেতু হিন্দুগণের অপরাধ-প্রবণতা কম। পূর্ব্ববঙ্গের সরকারি কারাগার-সমূহের বিবরণীতে দেখা গেল, বিগত ১৯০৫ হইতে ১৯০৭ অব্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১৩,২০৪ জন হিন্দু ও ২৭,৭০০ জন মুসলমান দুর্নীতির জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সমগ্র জন-সংখ্যার অনুপাতে প্রতি দশ হাজারে ১১.৩৪ জন হিন্দু ও ১৫৷৷০ জন মুসলমান কারাগারে গমনযোগ্য অপরাধের অনুষ্ঠান করে। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গেরও ফল এইরূপ। সুতরাং মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর অপরাধ-প্রবণতা কম।

আমরা দেখিলাম, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর রোগ-সহিষ্ণুতা অধিক, দীর্ঘ-জীবিতা অধিক, বিদ্যানুরাগ অধিক ও অপরাধ প্রবণতা কম। তথাপি হিন্দুকেই "অতি হেয় মূর্খ" ও নীতিজ্ঞান শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

(১২)

হিন্দুর সংখ্যাল্পতার কয়েকটি কারণ।

যে দৈবদুর্ঘটনার আবর্ত্তে পতিত হওয়ায় সামাজিক বঙ্গে হিন্দুর জন-সংখ্যা অসাধারণরূপে হ্রাস পাইয়াছিল, ভগবৎ-কৃপায় এক্ষণে তাহার অবসান হইয়াছে, বঙ্গীয় হিন্দুও সেই আধিদৈবিক বিপদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু একবার পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ায় জনসংখ্যা হিসাবে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে সত্বর মুসলমানের সমকক্ষতা লাভ করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভবপর হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধির পথে কতিপয় গুরুতর অন্তরায় বিদ্যমান। এই প্রস্তাবে সে সকলের আলোচনা করিবার সংকল্প করিয়াছি।

হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধির পথে প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন—প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বঙ্গদেশের যে অংশে হিন্দুগণ অধিক সংখ্যায় বাস করেন, সেই অংশ অর্থাৎ পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গ সাধারণতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর। হিন্দুপ্রধান পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষাদিরও সম্ভাবনা সর্ব্বদাই অধিক। মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে এসব 'বালাই' নাই বলিয়া সেখানকার লোকের সংখ্যা স্বভাবতই খরতর-বেগে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গেট সাহেব বলেন—

> The greater apparent prolificness of the Mohomedans, as compared with Hindus is due partly to the fact that they live mainly in the part of the province where the conditions are favourable to a rapid increase of the population.—p. 218.

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রকৃতির এই অনুকূলতা-নিবন্ধন তত্রত্য হিন্দুগণেরও বংশ-বৃদ্ধির পরিমাণ পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের হিন্দুগণের অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রতি দশহাজার জনের মধ্যে বঙ্গদেশের কোন্ প্রদেশে দশবর্ষ অপেক্ষা ন্যূনবয়স্ক বালক-বালিকার মোট সংখ্যা কত,তাহা দেখিলেই প্রকৃতির অনুকূলতা-জনিত তারতম্যের পরিমাণ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে :—

হিন্দু বালকবালিকার সংখ্যা	(প্রতি দশসহস্র জনের মধ্যে)
পশ্চিমবঙ্গে	২,৫৬২ জন।
মধ্যবঙ্গে	২,৪৩৩ „
উত্তরবঙ্গে	২,৮৩৫ „
পূর্ব্ববঙ্গে	২,৭৫৫ „

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের নির্ম্মল পানীয় ও পয়ঃ-প্রণালীর সংস্কার-বিষয়ক সমস্যার মীমাংসা না হইলে ঐ উভয় প্রদেশে ম্যালেরিয়া ও শিশুদিগের যকৃৎ রোগের প্রকোপ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। রাজপুরুষেরা অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে যত্নপ্রকাশ করিলে, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের জল-বায়ুর অবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত হইবার সম্ভাবনা। ঐ দুই প্রদেশের স্বাস্থ্যোন্নতি না ঘটিলে, তত্রত্য হিন্দুদিগের স্বাস্থ্যোন্নতি তথা অধিক বংশ-বৃদ্ধির আশা অতি অল্প। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা তত্রত্য সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধির পথে আর একটি গুরুতর অন্তরায়। এই অন্তরায় যে শীঘ্র দূর হইবে, তাহা বোধ হয় না।

দেশে জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতা-বর্দ্ধন ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ-নিবারণ হিন্দু-সমাজের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার সাধ্যাতীত ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং এই দুইটি কারণকে আমরা আপাততঃ অপ্রতিবিধেয় কারণের শ্রেণী-ভুক্ত করিতে বাধ্য। এই দুই কারণ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি আশানুরূপ হইবে না।

এক্ষণে যে সকল প্রতিবিধেয় কারণে হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধির পথ কণ্টকিত হইতে পারে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই কারণাবলীর মধ্যে অনেকেই বহুসংখ্যক হিন্দুর স্বধর্ম্ম-ত্যাগ-পূর্ব্বক ইস্লাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মাব-লম্বন-ব্যাপারটিকে প্রথম স্থান দান করিয়া থাকেন। প্রকৃত ধর্ম্মভাব অপেক্ষা দারিদ্র্য-নিবৃত্তি ও ভোগ-পিপাসার চরিতার্থতা-সম্পাদনের জন্যই অনেক হিন্দু স্বধর্ম্ম-ত্যাগী হয়, একথা আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখক রাজপুরুষেরাও বহু পরিমাণে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর স্বধর্ম্ম-ত্যাগীর সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে অধিক নাই। সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা গত জন-

গণনার সময়ে ২ লক্ষ ২৭৮০ হাজারের অধিক হয় নাই। সামাজিক বঙ্গে দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা ৬৮ হাজার ২২৯ জন মাত্র। ১৮৮১ অব্দের গণনায় তাহাদিগের সংখ্যা ৩৮।০ হাজারের অধিক ছিল না। বিংশতি বৎসরে স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধির নিয়মানুসারে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া, ন্যূনাধিক ৪৬ হাজারে দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং ১৮৮১ অব্দ হইতে ১৯০১ অব্দের মধ্যে, ২০ বৎসরে সামাজিক বঙ্গে ন্যূনাধিক ২২ হাজার জন খ্রীষ্টধর্ম্মে নূতন দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। এই ২২ হাজার জনের সকলেই যে বাঙ্গালী হিন্দু ছিল, এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং গড়ে প্রতি বর্ষে সামাজিক বঙ্গের এক হাজারেরও কম লোক খ্রীষ্টান হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মের আকর্ষণ অধিক নহে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণের পরিমাণ অতি অল্প। "স্থানে স্থানে কখনও কেহ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া থাকে।" ফলকথা, গড়ে প্রতি বর্ষে দেড় হাজারের অধিক হিন্দু স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করে না, ইহা একরূপ নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহাদিগের অধিকাংশই হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরভুক্ত। তথাপি, ইহাতে হিন্দুসমাজের যে ক্ষতি হয়, আমার বিশ্বাস, বহুসংখ্যক অনার্য্যের প্রতি বৎসর হিন্দু-ধর্ম্ম-গ্রহণে অনায়াসেই তাহার পরিপূরণ হইয়া থাকে; বরং স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুর তুলনায় হিন্দুধর্ম্মের নূতন দীক্ষা-গ্রহণকারীদিগের সংখ্যা অনেক অধিক হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং ক্ষতির অঙ্ক অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে আমাদের লাভের অঙ্কই অধিক। তথাপি হিন্দুসমাজ চেষ্টা করিলে, স্বধর্ম্মত্যাগকারীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া এই ক্ষতির পথ অধিকতর সঙ্কুচিত করিতে পারেন। অবশ্য যাহারা অর্থ-ক্লেশ নিবারণের জন্য ধর্ম্মান্তর-স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করা সমাজের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে। কিন্তু যাহারা ভোগের বা প্রবৃত্তির তাড়নায় বা স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য-বোধে অসমর্থ হইয়া পর-ধর্ম্মাবলম্বন করে, তাহাদিগের প্রতীকার নিতান্ত ক্লেশসাধ্য নহে। আমার মনে হয়, কথকতার সাহায্যে পূর্ব্বে যেরূপ হিন্দুধর্ম্মের মনোহর সার তত্ত্বগুলি দেশের অতি নিম্নস্তরে প্রচারিত করিয়া, জনসাধারণের নৈতিক উন্নতি বিধান করিবার ব্যবস্থা ছিল, পুনরায় সেইরূপ করিতে পারিলে, স্বধর্ম্ম-

ত্যাগীর সংখ্যা বহু পরিমাণেই হ্রাস পাইতে পারে। কথকতার উপকারিতা-সম্বন্ধে ৺বঙ্কিম বাবুর উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়-জয়, রাক্ষসীর প্রেম-প্রবাহ, দধীচের আত্ম-সমর্পণ-বিষয়ক সংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার-সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায় না, সেও শিখিত, —শিখিত যে, ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্যই জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোক-হিত পরম কার্য্য।—সে শিক্ষা কোথা? সে কথক কোথা? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। * * (অনেকে এখন ভাবেন) কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে? দক্ষযজ্ঞে বিশ্বযজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? (তাই) লোক-শিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোক-শিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।"

সুতরাং যাঁহারা হিন্দুসমাজের মঙ্গলকামী, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই স্বতঃ পরতঃ গ্রামে গ্রামে কথকতার সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মের পরমোদার ও পরম হিতকর মূলতত্ত্বগুলি প্রচারিত করাইবার চেষ্টা করা উচিত। স্বধর্ম্মে আস্থা না থাকিলে কোনও জাতি কখনও উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাকিলে পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার অভাব ঘটিলে জাতীয় চরিত্রে হীনতা প্রবেশ করে। এই কারণে, এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মই জাতীয় জীবনের মূল সূত্র বলিয়া স্বীকৃত। স্বধর্ম্মে আস্থা না জন্মিলে, ধর্ম্মোৎসাহে সমাজের আপামর সাধারণের হৃদয় পূর্ণ না হইলে, হিন্দুর মঙ্গলের কোনও সম্ভাবনা নাই,—বিগত সহস্র বর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক নিতান্তই অল্প। এই কারণে

আমাদের দেশের বহু মঙ্গলের আকর ধর্ম্মোৎসবসমূহ বৃথা আড়ম্বরে পরিণত হইতেছে। স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা থাকিলে যে উৎসব হৃদয়ে শতগুণ শক্তিদান করিত, শ্রদ্ধার অভাবে তাহাই বিবিধ কদাচারের আশ্রয় ও অবসাদের হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যকাল হইতে যে প্রণালীতে আমাদিগের বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে সমাজের সহিত তাহাদিগের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়া উঠে; তাহারা যে সামাজিক জীব, এ সংস্কার স্কুল কালেজে শিক্ষা-কালে তাহাদিগের মধ্যে অনেকের মনে স্থান-লাভ করিতেই পায় না। সমাজের প্রতি বিদ্রোহা-চরণে তাহাদের হৃদয় বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে না। বরং সমাজ-দ্রোহকেই তাহারা অনেক সময়ে সমাজ-হিতৈষণা বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন ভিন্ন আমাদিগের মঙ্গলের আশা নাই। ধর্ম্মশিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা অনেক স্থলেই স্বল্পায়াস-সাধ্য বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মমূলক কথকতার প্রচার করা তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে। এখনও চেষ্টা করিলে অনেক প্রাচীন কথকের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এবিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইলে, নূতন কথক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবেও বিলম্ব ঘটিবে না। ফলকথা, ধর্ম্মহীন শিক্ষাই আমাদের বিবিধ দুর্দ্দশার মূল, ইহা জানিয়া সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কথকতার সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মের সার তত্ত্বসমূহের প্রচারে যত্নশীল হওয়া উচিত। তাহা হইলে, স্বধর্ম্ম-ত্যাগীর সংখ্যা বহু পরিমাণে কমিবে, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত মন্দীভূত হইবে, লোকের চরিত্র-বল বৃদ্ধি পাইবে, কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতা দূর হইবে;—এক কথায় সকলপ্রকার পুরুষার্থই লাভ করিতে পারা যাইবে।

আর এক প্রকারে এই সমস্যার আংশিক মীমাংসা হইতে পারে। যাহারা মোহ বা অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা অনুতপ্ত হইয়া স্বধর্ম্মের আশ্রয়প্রার্থী হইলে, যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সমাজে গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীন মহারাষ্ট্র-ভূপতিগণের শাসন-কালে এইরূপে অনেক হিন্দুকে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া হিন্দুসমাজে পুনরাশ্রয় দান

করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবদিগের ভারতবিজয়-কালে সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের পুত্র ও অন্য কতিপয় হিন্দু নরপতি আত্ম-রক্ষার জন্ত ইস্‌লাম গ্রহণ-পূর্ব্বক আরবীয় নাম পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এক বৎসর পরেই তাঁহারা ইস্‌লাম ত্যাগ-পুরঃসর স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আরবদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন—ইতিহাসে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলকথা, স্বধর্ম্ম-ত্যাগকারী প্রকৃত অনুতপ্ত হইয়া স্বসমাজের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইলে, সেকালের ব্রাহ্মণেরা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া প্রায়ই তাহাকে পুনর্ব্বার স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এই পদ্ধতির পুনঃ প্রচলন এক্ষণে সম্ভবপর কি না, বঙ্গীয় সামাজিক-গণের তাহা বিবেচ্য। বিশেষতঃ যে সকল অজ্ঞান ও অনাথ বালক-বালিকা দুর্ভিক্ষকালে মিশনরীদিগের হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছে, তাহা-দিগকে পৈতৃক ধর্ম্মের আশ্রয়ে আকর্ষণের ব্যবস্থা করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। এবিষয়েও বঙ্গীয় সামাজিকগণেরমনোযোগ প্রার্থনীয়।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন, হিন্দুসন্তান ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক শিক্ষা কখনই লাভ করে না বলিয়াই হিন্দুদিগের বংশলোপ হইতেছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মাতাল হইয়া উৎসন্ন হইতেছে। কথাটা এক হিসাবে নিতান্ত মিথ্যা নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? মুসলমান শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দু শাস্ত্রেও সুরাপান—এমন কি, সুরার আঘ্রাণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ—জাতি-ভ্রংশকর। শুদ্ধ তাহাই নহে, হিন্দু শাস্ত্র সকল প্রকার অনাচারেরই ঘোর বিরোধী। কিন্তু সেকালের ইংরাজী শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী হিন্দুশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সে নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন; দেশের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ঘোষণা করিলেন যে, মদ্য-মাংসের সেবা ভিন্ন হিন্দুজাতির উন্নতি কখনই হইবে না। পানাহারের শাস্ত্রোক্ত নিয়ম প্রকাশ্যভাবে লঙ্ঘন করাই তাঁহারা সমাজের পক্ষে হিতকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অনেকেই কথা অনুসারে কাজ করিয়া, নৈতিক সাহসের ও সুদৃষ্টান্তের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছিলেন! ইংরাজসমাজে ও ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় সমাজে তাঁহাদিগের নামে প্রশংসাসূচক করতালি-ধ্বনি বর্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে

সমাজের উচ্চ বা শিক্ষিত স্তরে প্রকাশ্যভাবে যে ব্যবহারের বা দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত হইল, সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ" এই ন্যায়ে তাহারই অনুসরণ করিল। এক্ষণে চারিদিকে তাহারই বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, শিক্ষিত লোকেরা যদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, শাস্ত্রের অকারণ নিন্দা পরিত্যাগ করেন, যদি "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" এই ভগবদ্বাক্যের অনুসরণ-পূর্ব্বক সমাজ-রক্ষার জন্য পানাহারের বিধি-নিষেধ পালন করেন, ভোগের আদর্শ অপেক্ষা ত্যাগের ও নীতির আদর্শকেই শ্রেষ্ঠত্ব-দান করেন, ধর্ম্মোৎসব-কালে সাত্ত্বিকতা রক্ষার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখেন, সমাজবিধি-লঙ্ঘনকারীর প্রতি খড়্গহস্ত হন, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীর লোকের উচ্ছৃঙ্খলতার হ্রাস ও নৈতিক অবস্থার বহুল উন্নতি অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। মুসলমান-সমাজে ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রচার অতি অল্প; যে ২।৪ জন সে শিক্ষা-লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও সমাজের অধিকাংশ লোকের মতের বিরুদ্ধাচরণ বা কোরাণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। এই কারণে মুসলমান-সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিমাণ ও সমাজ-দ্রোহীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। মুসলমান সাহেবিয়ানার স্রোতে বা পাশ্চাত্য ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া আত্মহারা হয় নাই বা হইবার সুযোগ পায় নাই বলিয়াই তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভীরুতা ও শাস্ত্র-ভীরুতা অধিক—উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা কিছু অল্প। হিন্দুসমাজের যাহারা পাশ্চাত্যভাব-প্লাবিত নব্যদলের সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তাহাদিগের মধ্যেও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা অল্প। হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজ-রাজের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবনে হিন্দু-সমাজের উচ্চস্তর সহজেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহার পর সমাজের উচ্চস্তরের আদর্শে নিম্নস্তরেও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে। সুরা-পানাদি বিষয়ে পূর্ব্বে লোকের যে সংস্কার ছিল, পাশ্চাত্য-সংসর্গের ফলে তাহা কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, স্বেচ্ছাচার ও কদাচার, সভ্যতা ও নৈতিক সাহসের পরিচায়ক বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় ও কথকতাদির সাহায্যে ধর্ম্ম-শিক্ষার পদ্ধতি বিলুপ্ত

হওয়ায় বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক স্থলে কদাচারের স্রোত প্রখর হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তথাপি হিন্দুদিগকে মোটের উপর মুসলমান অপেক্ষা নৈতিকগুণে হীন বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দুরা যদি, কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশ মত, প্রকৃতই মুসলমান অপেক্ষা নৈতিক-বিষয়ে হীন হইত, তাহা হইলে কারাগারে মুসলমান বন্দীর অনুপাত হিন্দুর অপেক্ষা কখনই অধিক হইত না।

অনেকে মনে করেন, হিন্দু-সমাজে বহু বিবাহ-প্রথা লোপ পাওয়ায় হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধির পথ কণ্টকিত হইয়াছে। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। কারণ, সামাজিক বঙ্গে হিন্দু-পুরুষের অপেক্ষা হিন্দু-রমণীর সংখ্যা অল্প। এরূপ অবস্থায়, নৈতিক তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, বহু-বিবাহ সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান-সমাজেরও অবস্থা স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা-বিষয়ে প্রায় সেইরূপ। সুতরাং বহুবিবাহ-বিষয়ক তর্ক নিরর্থক।

বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক—এই কথা অনেকের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে বাঙ্গালী হিন্দু-রমণীর প্রকৃত সংখ্যা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। সামাজিক বঙ্গে সর্ব্বপ্রকার হিন্দু-রমণীর মোট সংখ্যা আদম-সুমারীর তালিকানুসারে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০৪। তন্মধ্যে উড়িয়া রমণীর সংখ্যা ১,৩৯,৩০১; মারওয়াড়ী, মারাঠী, গুজরাথী প্রভৃতি ভাষা-ভাষিণীর সংখ্যা ২,৩০৩। এতদ্ভিন্ন সামাজিক বঙ্গে হিন্দী-ভাষিণীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৮ জনের অপেক্ষা কম নহে। এই সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু ও এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলেই মোট ফল কিরূপ দাঁড়াইল, দেখুন :—

সামাজিক বঙ্গে মোট হিন্দু রমণী	১,১০,৩৬,২০৪ জন।
উড়িয়া রমণী	—১,৩৯,৩০১
	১,০৮,৯৬,৯০৩
মারওয়াড়ী, গুজরাথী, মারাঠী-ভাষিণী	—২,৩০৩
	১,০৮,৯৪,৬০০
হিন্দী-ভাষিণী হিন্দু রমণী	—৪,৪০,৯৫৮
	অবশিষ্ট ১,০৪,৫৩,৬৪২ জন বঙ্গ-রমণী।

ইহাই আমার মতে, সামাজিক বঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুরমণীর যথাসম্ভব প্রকৃত সংখ্যা। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় আদম-সুমারীর ভাষা-বিষয়ক তালিকায় নেত্রপাত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ভারতের অন্যান্য-প্রদেশে প্রায় ২৪,০০০ বাঙ্গালী হিন্দু-রমণী বাস করিতেছেন। ভাগলপুর, পাটনা ও ছোটনাগপুর বিভাগে, আসামে ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী হিন্দু-রমণীর সংখ্যা ৪৷৷০ লক্ষ। পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার সহিত এই দুই সংখ্যা যোগ করিলে মোট ১ কোটি ৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৪২ হয়। এখন বাঙ্গালী হিন্দুর মোট সংখ্যা ২ কোটি ২০ লক্ষ ৫১৷৷ হাজার। ইহা হইতে পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাদ দিলে পুরুষের সংখ্যা অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ বাঙ্গালী হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইতেছে ; যথা—

১,১১,২৩,৮৫৮	বাঙ্গালী পুরুষ (হিন্দু)।
+১,০৯,২৭,৬৪২	,, রমণী (,,)।
২,২০,৫১,৫০০ জন।	

বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অনূ্যন ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কম। সামাজিক বঙ্গে মুসলমান রমণীর অপেক্ষা মুসলমান পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ অধিক। সুতরাং বহু-বিবাহের সুবিধা কোনও সমাজেই তেমন নাই, স্থূলতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে।

পর পৃষ্ঠায় আদম-সুমারীর তালিকা-গ্রন্থের ১৩শ তালিকা হইতে হিন্দু-সমাজের কয়েকটি জাতির স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সঙ্কলিত হইল। তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ জাতির মধ্যেই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। তালিকায় গন্ধ-বণিক্, তিলি, সদ্গোপ, নাপিত, শূদ্র, সুবর্ণ-বণিক্, সূত্রধর, পোদ, ভুঁইমালী, নমঃশূদ্র ও বাগ্দী প্রভৃতি জাতির পরিমাণ-বোধক সংখ্যাগুলির যাথার্থ্যে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। যেহেতু বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশে ঐ সকল জাতি অন্য নামে পরিচিত। সুতরাং তাহাদিগের সংখ্যায় বিহারী ও উড়িয়া-দিগের অন্তর্নিবেশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারুই, কামার, তাঁতি ও তেলি প্রভৃতি উপাধিগুলি বঙ্গের ন্যায় বিহার ও উড়িষ্যাতেও বহু পরিমাণে প্রচলিত। এই কারণে সরকারি তালিকা হইতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির যে সংখ্যা

হিন্দু-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা।

(*From Table XIII.—Census Tables of Bengal.*)

জাতি।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।	বাস-স্থান।
ব্রাহ্মণ	৬,৬২,০৪৭	৬,০৫,২৪৮	সামাজিক বঙ্গে।
ঐ দৈবজ্ঞ	১৪,৮১২	১৬,১১৪	ঐ ঐ।
বৈদ্য	৪৪,২৭২	৪৪,৫৫৪	সমগ্র বঙ্গ ও শ্রীহট্ট-কাছাড়।
কায়স্থ	৫,৩৯,৩৯৯	৫,৩২,৪৫৫	সামাজিক বঙ্গে ও উড়িষ্যায়।
বারুই	৯৪,০৭৯	৮৯,০৩৫	সামাজিক বঙ্গে।
গন্ধ-বণিক্	৭০,১০৪	৭০,৪৮২	সমগ্র বঙ্গ ও শ্রীহট্ট-কাছাড়।
তিলি	২১,০৭৫	২২,৭৩১	পশ্চিম বঙ্গে।
নাপিত	২,৫৬,৬৬৩	২,৩৭,৯৩২	সমগ্র বঙ্গ ও শ্রীহট্ট-কাছাড়।
সদ্গোপ	২,৮৮,৬৭১	২,৮৯,৮০২	সমগ্র বঙ্গে।
শূদ্র	৯০,৩০৯	৯৫,৪৮০	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা।
তাম্বূলী	৩০,৩৮৮	২৭,৭৪১	সামাজিক বঙ্গে।
তাঁতি	১,৭১,৮৪৯	১,৬০,৪২৬	ঐ।
তেলি	৭৭,১৩৪	৭৩,১১২	খাস-বঙ্গে।
কৈবর্ত্ত (চাষী)	৯,৭৫,৯৪৫	৯,৮৩,৫৫৮	সমগ্র বঙ্গে।
ভুঁইমালী	৪৫,১৬৫	৪৪,২০০	ঐ ঐ।
সুবর্ণ-বণিক্	৬১,২১৮	৫৮,৫৫৯	উড়িষ্যা-বর্জ্জিত সমগ্র বঙ্গে।
সূত্রধর	৮৮,২১৫	৮৩,৯৮৫	সমগ্র বঙ্গে।
পোদ	২,৩৪,৭০৬	২,৩০,২১৫	সমগ্র বঙ্গে।
নমঃশূদ্র	৯,৩৫,৬৯২	৯,২৫,২২২	সমগ্র বঙ্গে।
বাগ্দী	৫,০৯,৯১২	৫,২২,১৫১	ঐ ঐ।

উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিহারী ও উড়িয়া ব্রাহ্মণ এবং বিহারী কায়স্থও অনেক থাকিবার কথা। কাজেই ঐ সংখ্যাগুলি প্রকৃত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির সংখ্যা নহে। বিহার ও উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ-জাতীয় পুরুষ অপেক্ষা ঐ জাতীয় রমণীর সংখ্যা প্রায় ৪৬ হাজার অধিক। পক্ষান্তরে সামাজিক বঙ্গে ব্রাহ্মণ-রমণীর সংখ্যা ৫৭ হাজার কম। এই প্রকার তারতম্যের কারণও সহজেই অনুমেয়। বিহার ও উড়িষ্যার অনেক ব্রাহ্মণ সামাজিক বঙ্গে কনেষ্টবল ও পাচকাদিরূপে জীবিকার্জ্জনের জন্য একাকী বাস করিতে বাধ্য হন। ইঁহাদিগের জন্যই সামাজিক বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ-জাতীয় পুরুষের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। যে সকল বৈদেশিক ব্রাহ্মণ সামাজিক বঙ্গে পরিবার-বিহীন অবস্থায় বাস করেন, তাঁহাদের সংখ্যা আনুমানিক ৪৫ হাজার বলিয়া ধরিলেও প্রকৃত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা ১০।১২ হাজার কম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সামাজিক বঙ্গে বিদেশী কায়স্থের সংখ্যা বিদেশী ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিক নহে। সুতরাং বৈদেশিক কায়স্থের সংখ্যা বাদ দিলে প্রকৃত বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান হইবারই সম্ভাবনা। বরং অনেক বাঙ্গালী কায়স্থ-জাতীয় পুরুষ সামাজিক বঙ্গের বহিঃপ্রদেশে চাকুরী উপলক্ষে একাকী বাস করিতেছেন,—এ কথা চিন্তা করিলে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজেও স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত কম।

পক্ষান্তরে আদম-সুমারীর ১৪শ তালিকায় নেত্রপাত করিলে দৃষ্ট হয় যে, খাস বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, নাপিত ও বারুইদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান; গোয়ালা, ধোপা, কৈবর্ত্ত (চাষী, জেলিয়া ও সাধারণ—এই ত্রিবিধ সমাজেই), সূত্রধর, কুমার, ভুইমালী, তাঁতি, তেলি, কোচ, নমঃশূদ্র, তিয়র, টিপারা প্রভৃতি সমাজে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। আর রাজপুত, বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্গোপ, কামার, তিলি, শুঁড়ী, পোদ, বাগ্দী, মুচি প্রভৃতি সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। যে তালিকাবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।—

আর একটি তালিকা।

জাতি	পুরুষ	স্ত্রী	বাসস্থান
ব্রাহ্মণ	৪,৫১,৭২৭	৪,৫২,২০০	খাস বাঙ্গালা।
নাপিত	১,৮০,২৩০	১,৮০,৬৮৪	ঐ
বারুই	৩৪,৪৭৭	৩৪,৬৩৫	ঐ
গোয়ালা	১,৯৯,৬২৪	১,৮৪,৪০৮	ঐ
ধোপা	৭৪,৫১০	৭০,৭০৬	ঐ
কৈবর্ত্ত	৯৫,৫১৫	৭৫,২৪৯	ঐ
ঐ (চাষী)	৮,৩৩,৭৬৫	৮,১৯,৭৮৩	ঐ
ঐ (জেলিয়া)	৭৪,৮২৪	৭২,৪৩০	ঐ
সূত্রধর	৩৯,৪২৯	৩৪,৬০৮	ঐ
কুমার	২,৬৮,৩৩৫	২,৭৬,৮৮৭	ঐ
তাঁতি	৮৯,৫৪৬	৮৪,৭৬৭	ঐ
তেলি	৭৭,১৩৪	৭৩,১১২	ঐ
কোচ	৫,৮৫,৭০৩	৫,৭৭,২৬১	উত্তর বঙ্গ।
তিয়র	১৬,০০৪	১৫,০৬৩	ঢাকা, ময়মনসিংহ।
টিপারা	৪৮,১৯৪	৪৫,১৯৭	পূর্ব্ববঙ্গ।
রাজপুত	৭,৯৯৪	১৩,৪৬৫	পশ্চিমবঙ্গ।
বৈষ্ণ	১১,৮৯০	১২,৫৫৮	ঢাকা, বাখরগঞ্জ।
কায়স্থ	৪,০০,৯৭৯	৪,৩৩,২৯৫	খাস বাঙ্গালা।
কামার	৯১,৭৪৭	৯২,০৬৩	ঐ
শুঁড়ী	১,৫১,৯২৬	১,৫৬,৯৩৮	ঐ
মুচি	১,৪৬,২৬০	১৫০,৭৬৩	ঐ

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত তালিকা-সম্বন্ধে আদম-সুমারীর বিবরণী—লেখক গেট সাহেব বলিয়াছেন,—

This table deals, not with the whole population, but with certain selected castes in certain districts or parts of the districts where they are specially numerous.—p. 291.

অর্থাৎ "এই তালিকায় কোনও জাতিরই সমগ্র জন-সংখ্যা সংকলিত হয় নাই। বঙ্গদেশের বিশেষ বিশেষ অংশে বিশেষ বিশেষ জাতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যেখানে যে জাতির প্রাধান্য আছে, সেখানকার সেই জাতীয় লোকের স্থূল সংখ্যা এই তালিকায় সংকলিত হইয়াছে।"* সুতরাং এই অসম্পূর্ণ তালিকার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সামাজিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই তালিকানুসারে খাস বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু খাস বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী কায়স্থ জীবিকার্জ্জন উপলক্ষে বাস করেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা এই তালিকায় ধরা হয় নাই; ধরিলে ঐ সমাজের স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যায় এক্ষণে যে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে, সেই পার্থক্য বহু পরিমাণে লোপ পাইবার সম্ভাবনা। ফলকথা, এই তালিকার সংকলিত সংখ্যা অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োদশ তালিকার সংখ্যাগুলিই অধিকতর নির্ভর-যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, সরকারি আদম-সুমারীর তালিকাগুলি যেরূপ স্থূলভাবে সংকলিত, তাহাতে ঐ তালিকার উপর নির্ভর-পূর্ব্বক কোনও সামাজিক সমস্যারই শেষ বা চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা বিধেয় নহে। কারণ হিন্দু-সমাজে এক এক জাতির মধ্যে আবার নানা শ্রেণী বা উপবিভাগ আছে; সেই সকল উপবিভাগের গণ্ডীর বাহিরে অনেক সময়ে কন্যার আদান প্রদান হয় না। এ অবস্থায় আদম-সুমারীর তালিকায় নেত্রপাতপূর্ব্বক কোনও এক জাতীয় লোকের স্ত্রী-পুরুষের মোট সংখ্যা জানিতে পারা গেলেও, সে সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া বিবাহ-বিষয়ক কোনও সমস্যার শেষ মীমাংসা করা যাইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, বঙ্গের সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক

আন্দোলনকারীরা অনেক সময়েই এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অনর্থক তর্কের স্রোত-বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

বহু-বিবাহের পরই বিধবা-বিবাহের কথা। আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখকেরা ও এদেশের সমাজ-সংস্কারকেরা হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহের অভাবকে বাঙ্গালী হিন্দুর বংশবৃদ্ধির একটি প্রধান অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপশ্চিম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের নবশাক-সমাজে ও তন্নিম্নবর্ত্তী স্তরে বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে যাহাদিগের জল অনাচরণীয়, তাহাদিগের মধ্যেও বিধবা-বিবাহের প্রচার প্রায় দৃষ্ট হয় না। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন,—"ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (বঙ্গের) যে সকল হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার কারণ—দরিদ্রতা।" (৯পৃঃ) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—"অনেক হিন্দুজাতির মধ্যে ব্যয়-সাপেক্ষ হেতু পুরুষদিগের একবার বিবাহই দুর্ঘট। দ্বিতীয় কথা এই যে, অনেক হিন্দুজাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা লোকাচার-বিরুদ্ধ নহে; তথাপি ঐ প্রথা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। বলা বাহুল্য, ইহার প্রধান কারণ অর্থাভাব।" যেখানে কন্যার সংখ্যা অল্প, সেখানে পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা সহজেই বহুব্যয়-সাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোক অপেক্ষা কি বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অধিকতর দারিদ্র্যগ্রস্ত? আমার ত তাহা বোধ হয় না। তবে বঙ্গের নিম্নশ্রেণীতেও বিধবার বিবাহ দিন দিন বিরল-প্রচার হইতেছে কেন? আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অবলম্বিত উচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের অনুসরণে নিম্নশ্রেণীর লোকের আগ্রহাধিক্যই এই ঘটনার প্রধান কারণ।

বোধ হয়, এই কারণেই এদেশের সমাজ-সংস্কারকগণ উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তনের জন্য বহু দিন হইতে আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহাদিগের সে চেষ্টা সাধু কি গর্হিত, সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। সাধু হউক, গর্হিত হউক, তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হইলে বঙ্গীয় হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধির

পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে পারে, বলিবার কারণ এই যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলেই যে সকল বিধবার বিবাহ ঘটিবে, বা সকল বিধবাই বিবাহ-পাশে আবদ্ধা হইতে সম্মতা হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প। যে সকল সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল সমাজেও সকল বিধবার বিবাহে প্রবৃত্তি থাকে না, যাহাদের সে প্রবৃত্তি থাকে, তাহাদিগেরও সকলের বর জুটে না। মুসলমান সমাজেও, হিন্দুর তুলনায়, শতকরা দশ জনের অধিক বিধবার ভাগ্যে দাম্পত্য-সুখ-ভোগ ঘটিয়া উঠে না বলিয়াই বোধ হয়। কারণ ঐ সমাজে বিধবার সংখ্যা হিন্দু-সমাজের অপেক্ষা শতকরা দশ জন মাত্র কম। তাই বলিতেছিলাম যে, হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধির পথ "কিঞ্চিৎ" প্রসর হইতে পারে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও বিধবা-বিবাহের জন্য মুসলমানের যে "বংশবৃদ্ধি হয়, তাহা অতি সামান্য।" (হিন্দুসমাজ ১ম খণ্ড পৃঃ ৮)

কিন্তু বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দুই চারিজন ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু যাহাই বলুন আর যাহাই করুন, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের শতকরা ৯৯ জন অদ্যাপি চির-বৈধব্য-পালনকেই বিধবা জীবনের উচ্চতর আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করেন; বিধবার পত্যন্তর-গ্রহণ শতকরা ৯৯ জন হিন্দুরই নিকট ঘোর পাপ-জনক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, একথা বোধ হয় বিধবা-বিবাহের ঘোর পক্ষপাতীও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহা কুসংস্কার হউক, সুসংস্কার হউক, হিন্দু-সমাজের এই ভাবের শীঘ্র পরিবর্তন ঘটিবার কোনও সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার বা ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস-জ্ঞানের বিস্তারের সহিত, হিন্দুর এই ভাব হ্রাস পাইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ, দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অনেকে বিধবা-বিবাহের ঘোর বিরোধী—আবার যাঁহারা পূর্ব্বে ঐ প্রথার সমর্থন করিতেন, তাঁহাদিগেরও মধ্যে অনেকে এখন মত-পরিবর্ত্তন করিতেছেন। বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহের যে কিঞ্চিৎ প্রচার ছিল, তাহাও ক্রমশঃ রহিত হইয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে সমাজের প্রবৃত্তি কোন্ দিকে,

তাহা ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তর্কের মুখে যাঁহারা বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগেরও হৃদয় কার্য্য-কালে উহার বিপরীত দিকেই ধাবিত হয়, দেখিতে পাই। সুতরাং পুরুষ-পরম্পরাগত সংস্কার-বশে হউক, আর ধীরভাবে বিধবা-বিবাহের শেষ ফল চিন্তা করিয়া প্রতিকূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যই হউক, হিন্দুসমাজের পনর আনারও অধিক লোক বিধবার বিবাহ অনুমোদনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা হিন্দু বিধবার বিবাহ বিধি-সঙ্গত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং কেহ বিধবার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে, অপর কাহারও তাঁহার কার্য্যে বাধা দান করিবার অধিকার নাই। রাজপুরুষদিগের ও রাজবিধির এইরূপ আনুকূল্য-সত্ত্বেও হিন্দু-সমাজের প্রবৃত্তি বিগত ৫০ বৎসরেও বিধবা-বিবাহের অনুকূল হয় নাই ;—কখনও হইবে কিনা, সে বিষয়েও আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ বিদ্যমান। তাই আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখক গেট সাহেবও বলেন,—

There is no reason for supposing that the castes who forbid their widows to marry again or who discourage the practice are loosing their old prejudices. If anything the tendency is on the other direction.—p. 260.

সুতরাং বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন-হেতু বংশ বৃদ্ধি-বিষয়ে হিন্দুর যে "অতি সামান্য" ক্ষতি ঘটিতেছে, তাহাকে আপাততঃ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপ্রতিবিধেয় কারণ বলিয়াই আমাদিগকে মনে করিতে হইবে।

বাল্যবিবাহের প্রচার হিন্দুসমাজে বংশবৃদ্ধি-পথের একটি প্রধান কণ্টক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। জনক-জননীর দেহ ও মন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে সন্তান কখনও সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, অল্প বয়সে মাতৃত্ব-লাভ ঘটিলে শীঘ্রই জননী-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, একথা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন। সামাজিক বঙ্গে বাঙ্গালী-হিন্দুর কন্যাদিগের যেরূপ অল্পবয়সে মাতৃত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, মুসলমান সমাজে সেরূপ ঘটে না ;—ভারতের অন্য কোনও প্রদেশীয় হিন্দু-সমাজেও বোধ হয় বঙ্গের ন্যায় অল্প বয়সে স্ত্রীলোকেরা মাতৃত্ব-লাভ করে না। এই কারণে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ

সামাজিক বঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু-বিধবা।

মোট হিন্দু-বিধবার সংখ্যা	২৯,১২,৪৯০	
	—২০,০০০	উড়িয়া। (আনুমানিক
	২৮,৯২,৪৯০	
	—৬৩,০০০	হিন্দী-ভাষিণী। (”)
মোট বাঙ্গালী হিন্দু-বিধবা	২৮,২৯,৪৯০	
,, ,, মুসলমান বিধবা	১৮.৯[illegible],২২৯	
	৯,৩[illegible],২৬১	অধিক হিন্দু-বিধবা।

হিন্দু-বিধবা (অনধিক ৫ বর্ষবয়স্কা)	১,৯২০	জন।
,, (৫—২০ বর্ষবয়স্কা)	১,৪৭,৩০৮	,, ।
,, (২০—৪০ ,,)	৯,৩৯,৬৪৮	,, ।
,, (৪০ ও তদধিকবয়স্কা)	১৮,২৩,৬১৪	,, ।
মোট	২৯,১২,৪৯০	জন।

বলা বাহুল্য, এস্থলে বিধবাদিগের যে বয়সানুক্রমিক সংখ্যা প্রকাশিত হইল, তাহার মধ্যে বঙ্গ-প্রবাসী উড়িয়া বিহারী প্রভৃতি ভিন্ন ভাষা-ভাষিণী বিধবাদিগের সংখ্যাও অন্তর্নিবিষ্ট আছে। উড়িয়া ও বিহারীদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালী-সমাজে বাল্য-বিবাহের প্রচার অল্পতর। বঙ্গীয়-সমাজেরও নিম্নস্তর অপেক্ষা উচ্চস্তরে বাল্য-বিবাহের প্রচার কম; সুতরাং অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প, একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা-ভাষিণী বিধবা-দিগের সংখ্যা বাদ দিলে সামাজিক বঙ্গে অনধিক বিংশ-বর্ষীয়া বাঙ্গালী বিধবার সংখ্যা ১লক্ষ ৪৫ হাজারের অধিক হইবে না বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্যদেশে অনেকস্থলে আজীবন-কুমারীদিগের সংখ্যা বঙ্গীয় বাল-বিধবাদিগের অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে।

অপেক্ষা অন্য যে সকল প্রদেশের হিন্দুসমাজে বাল্য-বিবাহের প্রচার অধিক, সে সকল প্রদেশে দেশবাসীর স্বাস্থ্য বাঙ্গালীর ন্যায় হীন নহে—অল্প বয়সে শিশুর মৃত্যুও সেখানে এত অধিক হয় না। ইহার একটি কারণ যেমন বঙ্গের জল-বায়ুর অস্বাস্থ্যকরতা, তেমনই আর একটি প্রধান কারণ,—বঙ্গদেশে প্রচলিত একটি ভীষণ কুরীতি। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঐ কুরীতির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্য-বিবাহের বা অল্প বয়সে বালিকাগণের বিবাহের উপকারিতা স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশে শাস্ত্রোক্ত দ্বিরাগমন পদ্ধতি প্রচলিত না থাকায় বাল্যবিবাহের কুফলসমূহ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের জীবন-শক্তির অপহারক হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধেয় বসুজ মহাশয়ের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। বঙ্গদেশে যদি দ্বিরাগমনের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ যদি ঋতু-প্রাপ্তির পূর্ব্বে বধূর সহিত স্বামীর পরিচয়-সংঘটনের পথ রুদ্ধ করিবার দিকে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জনক-জননীদিগের ন্যায়, বঙ্গীয় হিন্দু জনক-জননীর সবিশেষ লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে বালিকাগণের অকালে যৌবনোদ্গম ও মাতৃত্ব-লাভ হয় না। সেই সঙ্গে যাহাতে কিশোর বয়সে প্রেম-মূলক উপন্যাস পাঠের সুযোগ তাহারা না পায়, যদি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও অকাল-যৌবনোদ্গম বহুপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। এবিষয়ে সমাজ-হিতৈষী প্রত্যেক হিন্দুরই সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

এই উপায়ে বাল্যবিবাহের একটি প্রধান কুফল নিবারিত হইতে পারে; অর্থাৎ সুস্থকায় দীর্ঘজীবী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধি-বিষয়ে বহু পরিমাণে সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু আর একটি গুরুতর কুফল নিবারণের জন্য বালিকাগণের বিবাহের বয়স কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। এদেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও স্বীকার করেন যে, বাল্যবিবাহে বাল-বৈধব্যের আশঙ্কা অধিক থাকে এবং যে সমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ, সে সমাজের পক্ষে সে আশঙ্কা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এই তথ্যটী আদম-সুমারীর বিবরণে সংগৃহীত বিধবার অনুপাতাঙ্ক হইতেও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। এস্থলে

এই বিষয়ের দুইটী তালিকা উদ্ধৃত হইল।* তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, খাস বাঙ্গালায় বাল্য-বিবাহের প্রচার-হ্রাসের সহিত বিধবার সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছেঃ—

অনূর্দ্ধ দশবর্ষবয়স্কা সধবার সংখ্যা।

(হিন্দু—হাজারকরা)

	১৯০১ অঃ	১৮৯১ অঃ	১৮৮১ অঃ
পশ্চিমবঙ্গ	১০৩	১২১	১৩৭
মধ্যবঙ্গ	৮৭	১০২	১২২
উত্তরবঙ্গ	৫৪	৬১	৬৬
পূর্ব্ববঙ্গ	৫২	৬৪	৭৮

১৫ হইতে ৪০ বর্ষবয়স্কা বিধবার সংখ্যা।

(হিন্দু—হাজারকরা)

	১৯০১ অঃ	১৮৯১ অঃ	১৮৮১ অঃ
পশ্চিমবঙ্গ	২২৯	২৬৩	২৮৯
মধ্যবঙ্গ	২৫৫	২৮০	৩০৯
উত্তরবঙ্গ	২২০	২৩৬	২৩৩
পূর্ব্ববঙ্গ	২২৬	২৪৭	২৮৩

---

* এস্থলে তুলনার সুবিধার জন্য অনূর্দ্ধ দশবর্ষবয়স্কা মুসলমান সধবার সংখ্যাও উদ্ধৃত হইল—

(হাজারকরা)

	১৯০১ অঃ	১৮৯১ অঃ	১৮৮১ অঃ
পশ্চিমবঙ্গ	৭৯	৮০	৯৯
মধ্যবঙ্গ	৮৭	৮১	৯৫
উত্তরবঙ্গ	৭২	৭৫	৭৭
পূর্ব্ববঙ্গ	৬৯	৪৫	৬০

এস্থলে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয়, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আদম-সুমারীর বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, হিন্দুসমাজের উচ্চ স্তর অপেক্ষা নিম্নস্তরেই বাল্য বিবাহের প্রচার অধিক। ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। ইহার কারণ যাহাই হউক, প্রকৃত ঘটনা যে এইরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও নানা অনিবার্য্য কারণে হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরে বালিকাদিগের বিবাহের বয়স পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। সেই সকল কারণের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা-বৃদ্ধি, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার বিলোপ, পণ-গ্রহণ-প্রথার বাহুল্য প্রভৃতিই প্রধান। নিতান্ত সুপাত্র হস্তচ্যুত হইতেছে না দেখিলে বঙ্গীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ সহজে অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দেন না। ফল কথা, হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহের বয়স-বৃদ্ধির সহিত সাধারণতঃ বাল-বিধবার সংখ্যা কমিতেছে। খাস বাঙ্গালায় কোন্ জাতীয় এক সহস্র স্ত্রীলোকের মধ্যে দ্বাদশ হইতে বিংশ-বর্ষীয়া বিধবা কত, তাহার একটী তালিকা আদম-সুমারীর তালিকা-গ্রন্থ হইতে এস্থলে সংকলিত হইল। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।—

(১২ হইতে ২০ বর্ষীয়া বিধবার অনুপাত)

ব্রাহ্মণ	হাজারকরা	৭১	জন।	নাপিত	হাজারকরা	৮৫	জন।
কায়স্থ	,,	৬৭	,,।	বাগ্দী	,,	৮৯	,,।
জুগী	,,	৭২	,,।	গোয়ালা	,,	৯৫	,,।
নমঃশূদ্র	,,	৭৮	,,।	কৈবর্ত্ত	,,	১০০	,,।
কামার	,,	৮২	,,।	তেলি	,,	১০৩	,,।
পোদ	,,	৮৩	,,।	কুমার	,,	১০৪	,,।
তাঁতি	,,	৮৩	,,।	কৈবর্ত্ত-চাষী	,,	৫০৪	,,।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশে, সামাজিক-প্রথা যাহাই হউক, রাজবিধি অনুসারে দ্বাদশবর্ষ বয়সে বালিকার বিবাহ অবৈধ বলিয়া গণ্য হয় না। হিন্দু শাস্ত্রকার-গণের মধ্যে, কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকিলেও, একটি বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত। ঋতুপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যা দান কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ কোনও হিন্দুই করিতে পারেন না,—করা বিধেয়ও নহে। কারণ, যৌবন-প্রাপ্তির পর বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলে তাহার ফল কিরূপ ভীষণ হয়, পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য দেশে অল্পবয়সে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইবার সুযোগ না থাকায় বিচ্ছেদ-বিভ্রাট Divorce ও ব্যভিচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—এ কথা এখন পাশ্চাত্য মনীষীরাও বুঝিতে পারিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহসিক লেকি স্বপ্রণীত History of European Morals নামক পুস্তকের প্রথমখণ্ডের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, আয়ারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই ইউরোপের অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা ঐ দেশের রমণীদিগের মধ্যে সতীত্বের গৌরব ও ব্যভিচারের অভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সংপ্রতি রেভারেণ্ড চার্লস ভায়েসী-নামক জনৈক বিলাতী ধর্ম্ম-প্রচারক ইংরাজ-সমাজে ব্যভিচার-স্রোত হ্রাস করিবার জন্য অল্পবয়সে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে স্বদেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। সে যাহা হউক, কলিধর্ম্ম-প্রবক্তা মহর্ষি পরাশরের মতে ঋতু-প্রাপ্তি না হইলে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ও মহাভারতকারের মতে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিত রাখা যাইতে পারে। মহর্ষি মরীচি বলেন,—

গৌরীং দদন্ নাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং রোহিণীং দদৎ।
কন্যাং দদদ্ ব্রহ্মলোকং রৌরবন্তু রজস্বলাম্॥

অর্থাৎ গৌরী-দানে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটে; (নবমবর্ষীয়া) রোহিণীর দানে বৈকুণ্ঠলোক ও দশম-বর্ষীয়া কন্যা-দানে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। এই মরীচি-বচন স্মরণ করিয়া প্রয়োগপারিজাত-কার বলিয়াছেন—

"গৌর্য্যাদি-বিবাহে যথোত্তর-ফলবিশেষমাহ মরীচিঃ—গৌরীং দদন্নিত্যাদি।"
আশ্বলায়নের মতে—

উর্দ্ধং দশাব্দাৎ যা কন্যা প্রাগ্ রজোদর্শনাৎ তু সা।
গান্ধারী স্যাৎ সমুদ্বাহ্যা চিরং জীবিতুমিচ্ছতা॥

অর্থাৎ দশাধিক-বর্ষবয়স্কা অনৃতুকা কন্যাকে গান্ধারী বলে। যিনি দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি এইরূপ গান্ধারী কন্যাকে বিবাহ করিবেন। এই আচার্য্য-বচনটি প্রয়োগপারিজাত-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফল কথা, শাস্ত্র-সীমা লঙ্ঘন না করিয়া, বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের নিম্ন স্তরে কন্যাগণের বিবাহের বয়স কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি-পূর্ব্বক সুস্থকায় দীর্ঘজীবী সন্তান-লাভের ও বাল-বিধবার সংখ্যা-লাঘবের পথ কিয়ৎ পরিমাণে পরিষ্কৃত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে জাতিগত প্রভেদই হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধির পথে একটি অতি প্রধান অন্তরায়। হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরবর্ত্তী "অনাচরণীয়" জাতিসমূহকে "আচরণীয়" করিয়া না লইলে তাঁহার মতে হিন্দুজাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে অনেকের, এমন কি, অনেক উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞ হিন্দুরও মতভেদ হইবে। সুতরাং মদ্বিধ ক্ষুদ্রব্যক্তি কর্ণেল মহোদয়ের মতে সায় দিতে না পারিলে, ভরসা করি, তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। জগতের সকল বিষয়ের ন্যায় জাতিভেদ-প্রথারও ভাল মন্দ দুইটি দিক্ আছে এবং আমার বিশ্বাস, উহাতে অপকার অপেক্ষা উপকারের মাত্রা অধিক। কিন্তু এই বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এপর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় যত চর্চ্চা হইয়াছে, তাহাতে সে বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা, পাঠকের নিকট চর্ব্বিত-চর্ব্বণের ন্যায় অপ্রীতিকর হইবারই সম্ভাবনা অধিক। বিশেষতঃ এদেশে জাতিভেদের উচ্ছেদ-সাধন-চেষ্টা সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। শাক্যসিংহের ন্যায় জ্ঞানবাদী, চৈতন্যের ন্যায় ভক্তিবাদী ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য লেখকগণের ন্যায় বিজ্ঞান-বাদীদিগের চেষ্টাও যখন এক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে, তখন জাতিভেদ প্রথা হিন্দু-সমাজের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে অধুনা কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের

নানাস্তরে যে সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে দেড়শত বৎসরের পাশ্চাত্য সংস্রবের পরও জাতিভেদের রক্ষার দিকেই সমাজের প্রবৃত্তি সমধিক দেখা যাইতেছে, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ফলতঃ জাতিভেদের উচ্ছেদ ও হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ এক্ষণে এদেশবাসীর নিকট সমানার্থক হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং জাতিভেদ প্রথা রহিত হইলে হিন্দুসমাজেরও লোপ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী হইবে বলিয়াই মনে হয়।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদের অস্তিত্ব অনিবার্য্য হইলেও সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদিগের প্রতি অনাদর-প্রকাশের যৌক্তিকতা কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিই স্বীকার করিতে পারিবেন না। বরং উহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য ও বহু দোষের আকর বলিয়াই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এবিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "জ্ঞান ও কর্ম্ম"—নামক গ্রন্থের ৩৫৪।৫ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই তাহার অনুমোদন করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাঁহার উক্তি এই:—

"এদেশের ও হিন্দুসমাজের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নিম্নশ্রেণীর জাতিরা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা আদরের যোগ্য হইয়াছে। তাহাদের এখন পূর্ব্বমত অনাদর করিতে গেলে তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইবে এবং সমাজেরও অপকার করা হইবে। কারণ, তাহাতে বর্ণে বর্ণে বৈরভাব উপস্থিত হইয়া হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব ন্যায়পরতা ও আত্মরক্ষা উভয়ের অনুরোধে হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উদার ভাব ধারণ আবশ্যক। বিবাহ ও আহার বাদ রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর জাতির সহিত আত্মীয় ভাবে ব্যবহার করা এক্ষণে হিন্দুজাতির কর্ত্তব্য। তাহাই উচ্চ হিন্দু-প্রকৃতির উপযুক্ত, এবং তাহাই উদার হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত। স্বয়ং রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। অতএব হীনজাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে।

"কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিবাহ ও আহার এই দুই বিষয়ই বা বাদ দেওয়া কেন? এ প্রশ্নের দুইটি সদুত্তর আছে। প্রথমতঃ এই দুই বিষয় বাদ

না রাখিলে চলিবে না। কারণ, অসবর্ণ বিবাহ, কেবল হিন্দুশাস্ত্র নহে, আদালতে প্রচলিত হিন্দু আইন অনুসারেও, অসিদ্ধ এবং লৌকিক বিবাহের আইন (১৮৭২ সালের ৩ আইন) হিন্দুদিগের পক্ষে খাটে না। আর নিম্নবর্ণের সহিত আহার শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও তাহাতে অধর্ম্ম হইবে বলিয়া অনেক হিন্দুর বিশ্বাস ও সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।"

মনীষী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বহু অভিজ্ঞতা-প্রসূত উক্তিগুলির প্রতি প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী হিন্দুর মনোযোগ প্রার্থনীয়। এইস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, জাতিভেদ-বিলোপের চেষ্টা অপেক্ষা সবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যথাসম্ভব কন্যার আদান-প্রদান চালাইবার আন্দোলন করিলে বহু সুফলের সম্ভাবনা। অধুনা ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি প্রায় সকল জাতির মধ্যেই নানা উপবিভাগের সৃষ্টি হওয়ায় কন্যার আদান-প্রদান কার্য্য বহুস্থলেই বিষম:ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। উল্লিখিত উপবিভাগসমূহের সংখ্যা-হ্রাস করিতে পারিলে বিবাহের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও বিবাহকার্য্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়-জনক হইবে। হিন্দুর বংশ বৃদ্ধির পথ এই উপায়ে কিয়ৎ পরিমাণে প্রসর হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে সবিশেষ অভিজ্ঞ। সুতরাং হিন্দুর বংশক্ষয় বা সংখ্যাল্পতার কারণালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গের হিন্দু-প্রধান জেলাসমূহের জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকরতা, নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব, ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ ও তন্নিবারণের উপায় প্রভৃতির প্রতি সাধারণের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি স্বীয় পুস্তিকায় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গাবতারণ করিয়া দেশবাসীকে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়াবলী জ্ঞাপন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। কাজেই কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল মহাশয় A Dying Race—How Dying ?—শীর্ষক প্রবন্ধমালার ৪র্থ ও ১৫শ প্রস্তাবে এ বিষয়ের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কিশোরী বাবুর মতে দারুণ ম্যালেরিয়াই বঙ্গবাসীর বংশক্ষয়ের

প্রধান কারণ। এবিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে আমি যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। ম্যালেরিয়ায় জাতীয় চরিত্রের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি গ্রীসদেশের অধঃপতনের ইতিহাস হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি তন্মধ্য হইতে দুই একটি অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রীসদেশে ম্যালেরিয়ার সূত্রপাত হওয়ার পর—

Gradually the Greeks lost their brilliance which had been as the bright freshness of the youth. This is painfully obvious in their literature if not in other forms of art. Their initiation vanished, they ceased to create and began to comment. Patriotism with rare exception became an empty name, for few had the high spirit and energy to translate into action one's duty to the state. Vacillation, indecision, fitful outburst of unhealthy activity followed by cowardly depression, selfish cruelty and criminal weakness are characteristics of the public life of Greece from the struggle with Macedonea to the final conquest by the arms of Rome.

It is surely not fanciful to trace to this source the subtle but unmistakable change which came over the Greek character after the 5th and to a greater degree after the fourth century before Christ

Joane's *Greek History and Malaria.* Ed (1909).

"গ্রীকগণের মেধা ও প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতে লাগিল। সাহিত্যেও সে মলিনতার সুস্পষ্ট ছায়াপাত হইল। লোকের উদ্যম ও উৎসাহ বিনষ্ট হওয়ায় "স্বদেশপ্রীতি" শব্দটি শূন্যগর্ভ নামে পরিণত হইল; কার্য্যকালে কর্ত্তব্যপথের অনুসরণ করিবার শক্তি লোকে হারাইল। নীচতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, আলস্য, দৃঢ় সংকল্পের অভাব প্রভৃতি তাহাদিগের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বে পরিণত হইল।" গ্রীক-চরিত্রের এই বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালী চরিত্রের সাদৃশ্য কি বিস্ময়কর নহে ? পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা বড়লাট প্রথম লর্ড মিণ্টোর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়।—

I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people, whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the best possible cast of countinance and features. There features are of the most classical European models with great variety, at the same time.

আমি আমার জীবনের মধ্যে একবার মাত্র তিন চারি মাসের জন্য ম্যালেরিয়া ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; ঐ সময়ে আমার প্রকৃতির যেরূপ শোচনীয়

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত গ্রীক ঐতিহাসিকের বর্ণনার সহিত তাহার বহুলাংশে বিস্ময়কর সাদৃশ্য বিদ্যমান। তখন আমার মনে হইত যে, যদি এই রোগে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল কষ্ট পাইতে হয়, তাহা হইলে আমার মনুষ্যত্ব বা মানসিক বল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পরন্তু দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াও বাঙ্গালীরা আপনাদিগের বহু সদ্‌গুণের অস্তিত্ব কিরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়াও আমার বিস্ময়োদ্রেক হইত। ফলতঃ দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া-ভোগের যে ফল "গ্রীকজাতির ইতিহাস ও ম্যালেরিয়া" নামক গ্রন্থের লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট আদৌ অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। আমি স্বল্পকাল-মাত্র যে ম্যালেরিয়া ভোগ করিয়াছিলাম, তাহার কথা অদ্যাপি—প্রায় দশবৎসর পরে, স্মৃতিপথে উদিত হইলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের লোকের চরিত্রে যে সংকল্পের দৃঢ়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার একটি প্রধান কারণ—বোধ হয় দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া-ভোগ বা ম্যালেরিয়া-দুষ্ট স্থানে বাস। এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক বলেন,—

Laziness and lack of enterprise are marked characteristic of these unfortunate people. Each generation, as it is born, is subjected not only to the same physical surroundings as were its parents, but also to an unhealthy moral atmosphere. The evil results of such a condition have often been observed by physicians and others.

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় কি এ কথার যাথার্থ্য অস্বীকার করিতে চাহেন? দুরন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-নিবারণের জন্য সভ্য দেশসমূহে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে অনেক সুফলও পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল উপায়ই বহুব্যয়-সাধ্য। আমাদিগের এই দরিদ্র দেশে সে সকল উপায়ের অবলম্বনে রাজপুরুষেরাও সাহসী হন না। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ম্যালেরিয়ার দমনে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, রোগের প্রকোপের তুলনায় তাহা নগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও কোনও দোষ হয় না। কিশোরী বাবু দেখাইয়াছেন যে, বঙ্গদেশের জনসংখ্যা বোম্বায়ের চতুর্গুণ ও মান্দ্রাজের দ্বিগুণ; বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় স্থূলতঃ ২০ কোটি টাকা, মান্দ্রাজের প্রায় ১৪ কোটি ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ১৫ কোটি টাকা। অথচ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ

সরকার দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানের জন্য বৎসরে সর্ব্বসমেত যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ও ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, কিন্তু বঙ্গদেশের আয়ের পরিমাণ ও লোকের সংখ্যা উক্ত উভয় প্রদেশ অপেক্ষা অধিক হইলেও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যবিভাগে বার্ষিক ২৮৷৷৹ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন না, এবং সে টাকারও অধিকাংশ উচ্চপদস্থ তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন-দানে, মেডিক্যাল কলেজের ব্যয়-নির্ব্বাহে ও সামরিক চিকিৎসা-বিভাগেই ব্যয়িত হইয়া যায়! ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সদস্যগণ এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ও ভারত গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে বজেটের সময়ে কিঞ্চিৎ অধিক অর্থসাহায্য করিলে এই শোচনীয় অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও এ বিষয়ে রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল মহোদয় "বঙ্গীয় হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ ও তাহার প্রতিকার" শীর্ষক প্রবন্ধমালার দ্বিতীয় প্রস্তাবে (বঙ্গদর্শন —১৩১৭ সাল, শ্রাবণ মাসের সংখ্যা দ্রষ্টব্য) হিন্দুজাতির ক্ষয়ের আর একটি বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দু আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংস্রবে হিন্দুসমাজে যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই হিন্দুজাতির ক্ষয়ের "প্রকৃত মূল কারণ।" সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব তাঁহার Descent of Man নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন-প্রকৃতি অতি দূরবর্ত্তী দুইটি জাতি পরস্পরের নিতান্ত সন্নিহিত হয়, তখন কিছুদিন কি এক অজ্ঞাত কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির মধ্যে নূতন পীড়ার আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে দুর্ব্বলজাতি দেশত্যাগ করিয়া কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করিলেও, তাহারা পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় না। ডারউইন মহোদয় ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আহার, জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-প্রণালী, আচার ব্যবহার ও চাল-চলনের পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পথ অবলম্বন করিলে অনেক সময়ে অনেক জাতির—বিশেষতঃ ঐ জাতীয় শিশুগণের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ঘটিয়া থাকে। Variation of Animal and Plant under

Domestication নামক পুস্তকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, জীবগণ যে অবস্থায় দীর্ঘকাল হইতে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে অভ্যস্ত, সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাহাদের জনন-যন্ত্রসকল বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় ও তাহারা ন্যূনাধিক বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। সভ্যজাতীয় লোকে ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন অধিকতর সহ্য করিতে পারে বটে; তথাপি তাহাদিগের যে ঐ পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুই ক্ষতি হয় না, এমন কথা কখনই বলা যায় না।

রাধারমণ বাবু ডারউইন মহোদয়ের এই সকল সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে,—বাঙ্গালী হিন্দু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রব-লাভের পর অনুকরণ-প্রিয়তা গুণে অল্পদিনের মধ্যে সাহেবী আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার ও চিন্তা-প্রণালীর অবলম্বন করিয়া আপনাদের পূর্ব্বপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারই ফলে বাঙ্গালী সমাজে শিশুদিগের মৃত্যু-বাহুল্য ও যুবকগণের জনন-শক্তির সবিশেষ্ খর্ব্বতা ঘটিয়াছে।

ডারউইনের মতে দুই বিভিন্ন-প্রকৃতি জাতি জেতৃ-জিত-সূত্রে পরস্পরের সন্নিহিত হইলে জেতৃজাতির উদ্যমশীলতা, সাহস ও কর্ম্ম-দক্ষতাদি-দর্শনে বিজিত জাতির হৃদয় বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উঠে, এবং নানা কারণে তাহাদের উপার্জ্জনপথ ও কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে থাকায় তাহারা উৎসাহ ও আত্ম-নির্ভরতা হারাইয়া ফেলে। বিজিত জাতির এই অবস্থাকে তিনি Dullness of Spirit বা মানসিক অবসাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাধারমণ বাবু বলেন,—বিগত সার্দ্ধশতাব্দী কালে বাঙ্গালী হিন্দুর এইরূপ দশাই ঘটিয়াছে—বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয় পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়াছে এবং যে বঙ্গদেশ অশেষ শিল্প-পণ্যের উৎপত্তিস্থান ছিল, সেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা কতকটা সাধ করিয়া ও কতকটা দায়ে পড়িয়া "প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে বেতে" একেবারেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আপনাদের দেশের পুরাতন আদর্শের সহিত নূতন পাশ্চাত্য আদর্শের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারায়, হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-বিষয়ে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এই বিপ্লবে হিন্দুর মন কিরূপ ভীত চকিত, বিচলিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বর্ণনা রাধারমণ বাবু স্বামী

বিবেকানন্দের "বর্ত্তমান ভারত" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবের ফলে সমাজভুক্ত হিন্দুগণের মন আর সমাজের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট নহে—কাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ-পরতা বাড়িতেছে, দেবালয়-সংস্কার, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারাদি শুভকার্য্য সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যপদেশে যথেচ্ছাচার বাড়িতেছে, সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ প্রায় ছিন্ন হইয়াছে, ত্যাগের পরিবর্ত্তে ভোগের আদর্শই প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এসব "হিন্দুর ধাতে" সহ্য হইতে পারে না; যে জাতি বংশ-পরম্পরায় যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, সেজাতি তাহার পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র সহ্য করিতে পারে না। তাই আজ হিন্দুজাতির হ্রাস হইতেছে। মুসলমান-সমাজে সাহেবিয়ানা তেমন প্রবেশ লাভ করে নাই; সেইজন্য মুসলমান সমাজে এমন বিপ্লবও ঘটে নাই। তদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত মুসলমান-সভ্যতার বিরোধ হিন্দু সভ্যতার অপেক্ষা অল্প। এজন্যও মুসলমানের সমাজে হিন্দুর ন্যায় বিপর্য্যয় ঘটে নাই। এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া রাধারমণ বাবু বলেন, হিন্দুকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ ও অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, ভাবে ও আদর্শে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-পদ্ধতির যথাসম্ভব অনুগামী হইতে হইবে। তাঁহার মতে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে "স্বদেশী" না হইলে হিন্দুজাতি পূর্ব্ব স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে না। ইহাই তাঁহার মতে হিন্দুজাতির ক্ষয়-নিবারণের একটি অতি প্রধান উপায়।

রাধারমণ বাবুর মূল সিদ্ধান্তটি সর্ব্বাংশে সমর্থন-যোগ্য কি না, দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে হিন্দুর বিস্ময়-বিমূঢ়তা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অযথা বলিয়া মনে হয় না। আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, ভাবে ও আদর্শে যথাসম্ভব স্বদেশী হইতে না পারিলে যে সামাজিক বিপ্লব নিবারিত হইবে না ও বঙ্গীয় হিন্দুজাতি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস এখন অনেকেরই মনে স্থান-লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য আহার বিহার ও

আচার ব্যবহার যে এদেশের উপযোগী নহে, এবিষয়েও বোধ হয় বিজ্ঞব্যক্তি-দিগের দ্বি-মত হইবে না। বৈদেশিক আদর্শে, ধর্ম্ম-হীন শিক্ষায় ও সমাজ-শাসনের অভাবে বিলাসিতা ও অসংযমের বৃদ্ধি অনিবার্য্য। সংযমের অভাব জননী-শক্তির খর্ব্বতা-সাধক ও নানা প্রকারে স্বাস্থ্যের হানিকর; এ বিষয়েও মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। বিজ্ঞবর ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও আচার-ভ্রষ্টতাই ভারতবাসীর পরমায়ু-ক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মুসলমানের তুলনায় হিন্দু জাতিকে প্রায় সকল বিষয়েই হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া-ছেন ও স্থানে স্থানে এ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ন্যায়ের সীমা-লঙ্ঘন করিয়াছে, ইহা দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছি। কাল-চক্রের পরিবর্ত্তনে হিন্দুর আর পূর্ব্বের সুখ-সৌভাগ্য বিদ্যমান নাই, নৈতিক বলেও হিন্দু পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া কি ন্যায়ানুমোদিত? এরূপ চেষ্টায় কি কোনও শুভফলের সম্ভাবনা আছে?

সমাজের এইরূপ সর্ব্বথা দোষদর্শিনী নীতির উল্লেখ করিয়া দিন কয়েক পূর্ব্বে জর্ম্মান সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান যুবরাজ মহোদয় একটি প্রকাশ্য সভায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ-পূর্ব্বক আমি এই দীর্ঘ প্রবন্ধমালার উপসংহার করিলাম।—

Show us the paths which our German people must tread that it may take its place among the nations which *in accordance with its mental and physical powers is due to it by right.* It does not suffice to know the weaknesses and defects of our country, for this knowledge easily leads to ill-humour, and to unfruitful criticism.

পরিশিষ্ট।

(৮৬ পৃষ্ঠার ১৫শ পংক্তির পর)

স্বীয় পুস্তিকার ৫১ পৃষ্ঠায় বহু গবেষণার দ্বারা কর্ণেল মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে "লেখাপড়া জানা" লোকের মোট সংখ্যা ১লক্ষ ৫০হাজার বা প্রত্যেক ১২৭জনের মধ্যে ১ জন লেখাপড়া জানা লোক আছে! এখন ১২৭জনের মধ্যে ১জন হইল, হাজার করা ৮জনের অধিক কিছুতেই হয় না। কিন্তু ৬২পৃষ্ঠায় অধম জাতির শিক্ষা-প্রসঙ্গে শুদ্ধ "নমঃশূদ্র-দিগের মধ্যেই হাজার করা ৩৩জন লিখিতে পড়িতে পারে" বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন! আবার ৬৭পৃষ্ঠায় হাজারকরা ৭৮জন হিন্দু বাঙ্গালী লেখাপড়া জানে বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন। হাজার করা ৭৮জন হইলে প্রতি ১৩জনে ১জন হয়। কিন্তু ৫১পৃষ্ঠায় ১২৭জনের মধ্যে ১জন লেখাপড়া জানে, বলা হইয়াছে! প্রকৃতপক্ষে লেখাপড়া জানা বাঙ্গালী হিন্দু নরনারীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২২লক্ষের ন্যূন নহে। সামাজিক বঙ্গের মোট জন-সংখ্যার অনুপাত অন্যূন হাজার করা ৯৯.৭ জন বাঙ্গালী হিন্দু লিখিতে পড়িতে পারে বলিতে হয়। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমগ্র বঙ্গে ১॥০ লক্ষের বা প্রতি ১২৭ জনের মধ্যে ১জনের অধিক "লেখাপড়া জানা" বাঙ্গালী খুঁজিয়া পান নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়।

সূচীপত্র।

ভ্রম-সংশোধন—১৭ পৃঃ ১০ ও ১১ পংক্তির ৩,৬৫ ও ৫,১৮ স্থলে ৩·৬৫ ও ৫·১৮ হইবে।

৩২ পৃঃ ১২ পং "গৌরবকামী" স্থলে "উন্নতিশীল" হইবে।